উৎস মানুষ

৩২ বর্ষ • ১ম সংখ্যা • জানুয়ারি-মার্চ ২০১২

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		
গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে খুঁটিয়ে দেখা	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
স্মারক বক্তৃতায় প্রদত্ত ভাষণ		৬
. পাঠকের দরবারে	তাপস ভট্টাচার্য	১০
বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ: কার স্বার্থে	আশীষ লাহিড়ী	১১
আধ্যাত্মিকতা—আলোকিত হওয়া না ধাপ্পাবাজি	জাভেদ আখতার	১৩
জলবায়ু পরিবর্তন পুনর্বিবেচনা	এস ফ্রেড সিঙ্গার	১৭
অসৌজন্য ও অসহিষ্ণুতা দুটি চিঠি		২৬
শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার আনা প্রয়োজন	সন্দীপ সিংহ	২৮
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র ও নীলরতন সরকার	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	৩১
জেহাদি বনবিহারী	সমীরকুমার ঘোষ	৩৭

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬

ফোন:৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com

ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

২০১১ শেষ হয় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে চোলাই-কাণ্ড ও আমরি কাণ্ড। ২০১২ শুরু হয়েছে অধ্যক্ষ নিগ্রহ পর্ব দিয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংগ্রামপুরে চোলাই মদ খেয়ে মারা পড়েছেন ১৭৩ জন। সত্যি বলতে কি, মানুষগুলো অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছিল, এবার বেঁচে গেল। ঘটনার জেরে রব উঠেছে যেখানে যত চোলাই ঠেক আছে ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। দীর্ঘদিন সযত্ন লালিত শ্রমনিবিড় এই কুটিরশিল্পটিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার আগে ভাবা উচিত। যারা তৈরি করে চালান করে, পাইকারি ও খুচরো বিক্রি করে, সেই সঙ্গে বিশাল সংখ্যক মানুষ যারা কেনে এবং 'জেনে শুনে বিষ করেছি পান' বলে পান করে, তাদের কথা যদি বাদও দিই তার বাইরেও যে বিশাল সংখ্যক পুলিস, আবগারি কর্মী রাজনৈতিক দাদা স্থানীয় মস্তান—তাদের কী হবে? কীভাবে চলবে তাদের পরিবার? অতএব ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিশ করো!

শিক্ষক-নিগ্রহ কাণ্ড নিয়ে এখন তোলপাড় সংবাদ-মাধ্যমে। কিন্তু এ নিয়েও বাঙালির ঐতিহ্য আছে। সুভাষচন্দ্রের ওটেন সাহেবকে চড় মারার ঘটনাটি মনে করুন। শিক্ষক-নিগ্রহ অবশ্যই নিন্দনীয় ঘটনা হলে প্রায় প্রতিদিন হাসপাতালের সুপারদের যে নিগ্রহ করা হয়ে থাকে, সেটাকে কোন খাতে ফেলা হবে?

সুপাররাও তো ডাক্তারি-ছাত্রদের শিক্ষক! সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন জাগাচ্ছে। যেমন, গত বেশ কয়েক দিন ধরেই জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা রিলে অনশন করছেন, তাঁদের অধ্যক্ষের বদলি ঠেকাতে। শিক্ষাসচিব দু-দফা বৈঠক করেও ছাত্রছাত্রীদের রাজি করাতে পারেননি। উল্টে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অশিক্ষক কর্মীরাও। ওঁরা সবাই আমরণ অনশন শুরু করতে চলেছেন। এ জাতীয় ঘটনার খবর অন্য কলেজ-স্কুল থেকেও আসছে। ফলে 'গেল, গেল' রবের মধ্যেও যে প্রশ্নটা উঠে আসছে—প্রকৃত ছাত্রদরদী শিক্ষকরা কি কখনও নিগৃহীত হন? তাঁদের নিগ্রহ করার মূর্খামি কি ছাত্ররা কখনও করে? প্রসঙ্গত তপন সিংহ পরিচালিত 'আতঙ্ক' ছবিটার কথাও আনা যায়। সেখানে সমাজবিরোধী হয়ে ওঠা সত্ত্বেও ছাত্রটির তাঁর পূর্বতন শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা একটুকুও কমে নি। শিক্ষক-নিগ্রহের নিন্দা করতে করতে এই বিষয়টা নিয়েও একটু ভাবা দরকার।

বহু কষ্ট করে সাধারণ মানুষের মনে সরকারি হাসপাতাল সম্পর্কে বিরূপতা তৈরি করা গেছে। ঝকঝকে, কেতাদুরস্ত বেসরকারি নার্সিংহোম মানেই সুচিকিৎসা—মানুষ এমনটাই ঠাওরেছে। কিন্তু বেচারারা জানে না সরকারি হাসপাতালে শুধু রোগীই মারা যায়, নার্সিংহোমে রোগীর সঙ্গে ধনে প্রাণে মারা পড়ে তার পরিবারও। একেই বোধহয় গ্রাম্য প্রবাদে বলে—আমও গেল ছালাও গেল!

আহরণ

গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে খুঁটিয়ে দেখা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই রচনাটিকে সাংগঠনিক আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য প্রাথমিক খসড়া দলিল হিসেবেই নিতে অনুরোধ করি। একমত-দ্বিমত থেকে বহুমতের সমন্বয় ঘটবার প্রত্যাশায় এই নিবন্ধ। যদি কোনো সংগঠন বা ব্যক্তি এই লেখাটি বা এর কোনো অংশ আলোচনা চালানোর উপযোগী মনে করেন, সার্থকতা সেটুকুই। তার অধিক গুরুত্ব, এ নিবন্ধের, আমি দাবি করি না। —লেখক]

গণবিজ্ঞান, গণসংস্কৃতি, গণনাট্য ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে 'গণ' শব্দের মুখ্য অবস্থান দেখে বুঝতে হবে এতে সাধারণ মানুষের বা জনগণের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। যে বিজ্ঞান শুধু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, লেবরেটরির গবেষণা, বিশেষজ্ঞের জটিল জ্ঞান বা যন্ত্রপাতির প্রয়োগ নিয়ে চর্চা করে সে-বিজ্ঞানের মধ্যে সাদামাটা মানুষজনেরা নাক গলাতে পারে না। কেমন যেন ভয়-শ্রদ্ধা মেশানো একটা দূরত্ব থেকে যায়। মানুষের সঙ্গে এই দূরত্ব ঘোচানোর জন্যই সাম্প্রতিক দেড়-দু'দশক ধরে বিজ্ঞান আন্দোলন বা গণবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড কর্মসূচী উঠে আসছে। ধীরে ধীরে হলেও কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এই আন্দোলন।

এই জনগণ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞান আন্দোলন সরাসরি মানুষের যাবতীয় সংকটের সমাধান ম্যাজিকের মতো এনে দেবে না ঠিকই, কিন্তু এটি সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এমন এক চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারবে যা প্রচলিত প্রগতিবিরোধী বিশ্বাস বা পিছু-টানা ধ্যান-ধারণা, দৈনন্দিন জীবনের অযৌক্তিক আচরণ, এবং বিভ্রান্তিকর জীবনবোধকে নতুন করে সাজাতে পারবে। রাষ্ট্র কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের করুণার ভরসায় থাকা নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুপ্রয়োগ মানুষকে আত্মনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে তৈরি করে এবং সত্য-অসত্য, উচিত-অনুচিতকে যাচাই করে নেওয়ার পথ দেখায়।

একটা কথা এই ফাঁকে খানিক পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে; বিজ্ঞানমনস্কতা যেমন কেবল জ্ঞান (knowledge) আর পাণ্ডিত্যের ফসল নয় (কেননা আমরা জানি পদার্থবিদ্যার কোনো অধ্যাপকও ঠিকুজি বিচার করেন, জিওলজির বিশেষজ্ঞ আংটিতে পাথর ধারণ করেন, প্রখ্যাত চিকিৎসকও শরীর-বর্ধক সিরাপ বা ব্রেন টনিক লিখে দেন), তেমনি আবার বিজ্ঞানমনস্কতা মানে শুধুমাত্রই যুক্তিপ্রয়োগ নয় (কেননা ধর্মবিশ্বাসী, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা কিংবা তস্করেরও নিজস্ব যুক্তি থাকে)। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান আমাদের মনের যুক্তিপ্রবণতাকে পরিশীলিত ও জাগ্রত করে, জীবনের মানোন্নয়ন ঘটায়।

বিজ্ঞানমনস্কতা যেমন কেবল জ্ঞান (knowledge) আর পাণ্ডিত্যের ফসল নয় (কেননা আমরা জানি পদার্থবিদ্যার কোনো অধ্যাপকও ঠিকুজি বিচার করেন, জিওলজির বিশেষজ্ঞ আংটিতে পাথর ধারণ করেন, প্রখ্যাত চিকিৎসকও শরীর-বর্ধক সিরাপ বা ব্রেন টনিক লিখে দেন), তেমনি আবার বিজ্ঞানমনস্কতা মানে শুধুমাত্রই যুক্তিপ্রয়োগ নয় (কেননা ধর্মবিশ্বাসী, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা কিংবা তস্করেরও নিজস্ব যুক্তি থাকে)।

এহেন শক্তিশালী চেতনার হাতিয়ারকে সফলভাবে কাজে লাগানো যাবে কি করে? বর্তমানে বিজ্ঞান-আন্দোলনের শরিক ছোট ছোট নিষ্ঠাবান সংগঠনগুলি বাস্তবে যে ছোট গণ্ডীর মধ্যেই আটকে আছে, থাকতে বাধ্য হচ্ছে, সেকথা তো সত্যি। তাহলে?...

নতুন চলার পথে বাধাবিপত্তি কাটিয়ে, হোঁচট খেয়ে, গিয়ে চলাই পথ হাঁটার নিয়ম। কিন্তু তার জন্য পথের খানাখন্দ আর বিপত্তিগুলো খুঁজে দেখে নিতে হয়। গণবিজ্ঞান আন্দোলন গত পনের-ষোল বছর ধরে সাধ্যমত সক্রিয় থেকেও বৃহৎ সমন্বিত শক্তি হয়ে উঠতে পারে নি। এর বড় কারণ মতাদর্শগত দিশা ও কর্মপদ্ধতির কুয়াশাচ্ছন্নতা, কিন্তু তার সঙ্গেও রয়েছে ভেতরের বিবিধ খানাখন্দের মত গোলমাল। যেমন, ব্যক্তিসম্পর্কে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব, পরমত-সহিষ্ণুতায় ঘাটতি, আত্মকেন্দ্রিকতা, সমস্যার কারণ বোঝায় বিভ্রম, সংকীর্ণতা, 'বিজ্ঞানবাদী' কুসংস্কার ইত্যাদি। এরকম সব টুকরো বাধা চলার পথে বড় অবরোধ সৃষ্টি করে। একথা ঠিক যে, নতুন একটা পথ কিংবা কাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলতে গেলে আনাচে কানাচে গর্ত ফাটল থাকবেই, কিন্তু এই ফাঁক-ফোঁকরগুলো

চিনে নিতে পারলে এবং অন্তর দিয়ে সততার সাথে অনুধাবন করতে পারলে সামনে এগোনোর পদক্ষেপ জোরদার হবে, আদর্শনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠকদের আপাত হতাশা কমবে, আন্দোলনের কাঠামো মজবুত হবে। তাই কাজের ক্ষেত্রের গোলমালগুলোকে এক এক করে বিচার করে নেওয়া যাক।

শিক্ষা

ব্যাপক মানুষের "প্রকৃত শিক্ষা"র প্রয়োজন সবার আগে। আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখার এটা পয়লা নম্বর শর্ত। তবে এ শিক্ষা পরীক্ষা পাশের প্রথাগত শিক্ষা অবশ্যই হবে না, স্কুলপাঠে সিলেবাসের বাইরে প্রকৃতি-সমাজ-মূল্যবোধ থেকে নেওয়া শিক্ষা হবে। যতদূর সম্ভব আকর্ষণীয় এবং 'ইন্টারেস্টিং' পদ্ধতিতে এটা করা দরকার। এবং বড় কথা, এ কাজের মধ্যে দিয়ে কর্মীদেরও অধিকতর 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠার মানসিকতা থাকতে হবে। পশ্চিমবাংলার বেশ কয়েকটি জেলায় (অন্য রাজ্যের আলোচনা আনছি না) প্রতি বছর এরকম বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা মূল্যায়ন কর্মসূচী অনেক সংখ্যক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালাচ্ছে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের (পশ্চিমবঙ্গ) অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি সংগঠন। আঞ্চলিকভাবে নিয়ন্ত্রিত এই জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল্যায়ন কাজ প্রায় বছর দশেক ধরে এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে আসছে। কিন্তু এর বিস্তার যা হওয়া উচিত তার চেয়ে যথেষ্ট কম। নতুন নতুন কর্মীরা আসছে না কাজে। প্রশ্নমালায় কিছু একঘেয়েমিও রয়েছে। এই নিয়মিত শিক্ষণ-কর্মসূচীটি কেন স্কুলের মূল পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না? যথেষ্ট মাত্রায় শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মীরা কি উদ্যম-উদ্যোগে আকৃষ্ট হয়ে আসছে না?

কিছু কিছু ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ সাক্ষরতা, বয়স্ক শিক্ষা, নিম্নবিত্ত ছেলেমেয়েদের কোচিং-জাতীয় কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে চালাচ্ছেন। কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোথায় যেন প্রাণের অভাব। ঝিমিয়ে যাচ্ছে, নয়তো যান্ত্রিক নিয়মরক্ষা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন এই শিক্ষাদানের কাজে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির অভিজ্ঞতাতে আসছে তাই। মনে হয়, জীবন-জীবিকা ও সমাজবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানবিক কাজ চরিত্রগতভাবে 'মিশনারি' মার্কা কাজের মত রূপ নিচ্ছে— যেন বিপন্নকে সাহায্য করা। গণবিজ্ঞান চেতনার শিক্ষা তো তা নয়, আরো বৃহত্তর লক্ষে নিবদ্ধ থাকা দরকার। কর্মীরা গলতিটা বুঝতে পারবে না, মনে হচ্ছে "কেন যেন একঘেয়ে লাগে; আমরা এগোচ্ছি কোথায়?"...উদাহরণ—হাতিবাগানের 'চেতনা'র দৈনিক সান্ধ্য স্কুল। সমাজ ও মানবমন উন্নয়নের স্বপ্ন চোখে আছে, কর্মপদ্ধতিতে নেই। এই পরিবর্তনটা আনতে হবে। আনা সম্ভবও।

জ্ঞান (knowledge) ও বিশেষ-জ্ঞান (expertise)

প্রয়োজনীয় পড়াশুনার অভ্যেসটা, দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ সক্রিয় বিজ্ঞানকর্মী মধ্যে যথেষ্ট কম। 'বিজ্ঞান' তাকে বলে তার প্রাথমিক সংজ্ঞাটুকুও অনেক কর্মীর কাছে স্পষ্ট নয়। বিজ্ঞান, সমাজ ও আর্থসামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞানটুকু না থাকলে হাটে-মাঠে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের মন থেকে কুসংস্কার অবিজ্ঞান তাড়ানোর কাজটা 'সর্ষের মধ্যে ভূত' হয়ে দাঁড়ায়। সংগঠনের ভেতর নিয়মিত পাঠচক্র বা স্টাডি ক্লাশ কিংবা বিষয়গত তর্ক-বিতর্ক ক্রমশ প্রায় উঠেই যাচ্ছে। এমনকি অনেক পত্রিকা-সংগঠনের বন্ধুরা নিজেদের পত্রিকাটাই ভালো করে পড়ে না। বিভিন্ন গণ-অনুষ্ঠানে সংস্থার ব্যানারের আড়ালে নিজেদের জ্ঞানের ঘাটতি দিব্যি লুকিয়ে রাখতে পারে কর্মীরা। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বক্তব্য-ভাষণ-শ্লোগানগুলো 'ওপর চালাকি' হয়ে যায়। সময়ে লোকে সেটা বুঝেও যায়। তখন ভরসা কমে। দলান্ধ ('ধর্মান্ধে'র সমার্থক) বশংবদ পার্টি কর্মীদের থেকে গণবিজ্ঞানকর্মীদের আচরণ ও আদর্শগত অবস্থান সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া আবশ্যক, খেয়াল রাখতে হবে।

এদিকে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক-প্রাযুক্তিক সংকটে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, আইনজ্ঞ ইত্যাদিদের অবস্থান সাধারণের থেকে অনেক দূরে; কিছু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমী বিশেষজ্ঞদের বাদ দিলে অধিকাংশেরই উন্নাসিকতা ও অহমিকাবোধ সাধারণ মানুষের সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ তৈরি হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে দরকারি সংযোগের কাজটা সেতু রচনার মত 'কমিটেড' বিজ্ঞান কর্মীদেরই করতে হবে, উপায় নেই।

স্বাস্থ্য-কৃষি-পণ্য-প্রযুক্তি-পরিবেশ

দুনিয়া পাল্টাচ্ছে দ্রুত। সমস্যাগুলি উঠে আসছে নবসাজে, অধিকতর গভীর সংকট নিয়ে। তাল রাখতে পারছে না যুক্তিবাদী গণ-বিজ্ঞান গণ-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি। '৮০-র দশকে পশ্চিবঙ্গে 'ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম' (DAF) ও সমগোত্রীয় জনস্বাস্থ্য সংগঠনগুলি মানুষের চোখ ফুটিয়েছিল বিরাট অন্ধকার জগৎটাকে নিয়ে। জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব, অপ্রয়োজনীয় ও নিষিদ্ধ ওষুধ, বিজ্ঞাপনের চাতুরি, কবিরাজি-উদ্ভট থেরাপি হোমিওপ্যাথির মতো বিজ্ঞান-বিহীন চিকিৎসা, ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের মোহগ্রস্ত ধারণায় ধাক্কা এসেছিলো দারুণভাবে। আজ '...ফোরামে'র কর্মসূচী নিবু নিবু। বহু স্বাস্থ্য-সংগঠন বসে গেছে। আর বিপরীতে গ্যাট, পেটেন্ট আইন, ডব্লু টি ও, ভয়াবহ আগ্রাসী ভূমিকায় এগিয়ে আসছে। ডাক্তার-রোগী কিংবা কৃষিবিজ্ঞানী-কৃষক সম্পর্ক দ্রুত তিক্ততা বাড়াচ্ছে। গণবিজ্ঞানে এদের গুরুত্ব কতখানি উপলব্ধি করা যাচ্ছে?

কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার আর কীটনাশক বিষ নিয়ে গলা ফাটানো চিৎকার এখন আর যথেষ্ট নয়। সবুজ বিপ্লবের কুফল, জৈব সম্পদ অপহরণ, মেধাস্বত্ব বিক্রি, আর 'মনস্যানো'র মত বিপুল শক্তিধর আন্তর্জাতিক শত্রুর সূক্ষ্ম রাজনৈতিক আগ্রাসন এই মুহূর্তে অনুধাবন ও প্রতিরোধ করতে না পারলে দুয়ার পারের

নব-শতাব্দীতে নিত্য-ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের অকল্পনীয় সংকটে আমরা ডুবে যাবো।

ধোঁয়া ছড়ানো কলকারখানা অথবা দূষণকারী প্লস্টিক ব্যাগ বন্ধ করতে হবে, বাতিল করতে হবে—এরকম একবগ্‌গা দাবি বিজ্ঞান আন্দোলনে আরও উত্তেজনা ছড়ায়। নাগরিক মঞ্চের মত সংস্থা আইনি লড়াই-এ দূষণ বর্জনের দাবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি সংযুক্ত করে নিলেও সাধারণভাবে পরিবেশবাদী ছোট ছোট বিজ্ঞান সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি কম-বেশি এক চক্ষু হরিণের মত। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনজীবনের বাস্তব সমস্যাগুলোর ভালোমন্দ ও গ্রহণযোগ্য বিকল্পকে বিচার করা হচ্ছে না। 'আধুনিক প্রযুক্তি মানেই খারাপ'-এরকম মস্তিষ্ক-ধুয়ে-দেওয়া কট্টর ধারণা কখনো বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। ভোগবাদের প্রতি ঘৃণাকে নব-প্রযুক্তির প্রতি বিদ্বেষের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অনেকটা যেমন নারীমুক্তির অর্থ করা হয় পুরুষবিদ্বেষ।

সংস্কার, কুসংস্কার, বিজ্ঞানবাদী কুসংস্কার

সংস্কার কিংবা কুসংস্কার বলতে আমরা প্রথমেই বুঝি তাগা, তাবিজ, জ্যোতিষ, 'অলৌকিক নয় লৌকিক'। কিন্তু বুঝতে হবে যে সভ্যতা যত আধুনিক হচ্ছে কুসংস্কারের চেহারাও তত মডার্ণ বিজ্ঞানের মুখোশ দিয়ে সাজানো হচ্ছে। রেইকি, ম্যাগনেটো থেরাপি, ব্রেন টনিক, মেটাল ট্যাবলেট, সেক্স টনিক ইদানীং যুক্তিবিচার বোধবুদ্ধিকে কায়দা করে ফেলেছে। অন্যদিকে আবার জটিল দ্বন্দ্বের উদাহরণও আছে: আধুনিক ভোগবাদী স্বার্থপর জীবনের দুঃসহ পীড়নে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত কোন ব্যক্তির কাছে ঈশ্বরভক্তি জাতীয় একান্ত নিজস্ব বিশ্বাস তাকে মানসিক ভরসার জায়গা দিচ্ছে। এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে গণবিজ্ঞান-যুক্তিবাদী কর্মীরা প্রায়শই আক্রামক উগ্রপন্থার রাস্তা নেয়। এতে কর্মীটির নিজের তৃপ্তি হতে পারে কিন্তু মানুষ দূরে সরে যায়। কর্মপদ্ধতির মধ্যে মানুষের প্রতি সহানুভূতিকেও জায়গা দিতে হবে।

এছাড়া আছে সর্বসমস্যা হর উপায় হিসেবে বিজ্ঞানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার চেষ্টা। এ এক বিজ্ঞানবাদী কুসংস্কার। যেন 'ভগবান'কে ঠেলে সরিয়ে সেখানে 'বিজ্ঞান'কে বসিয়ে দেওয়া। এই ভ্রান্তি মোচনের জন্য মনে হয় বিজ্ঞানের ইতিহাস, অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-বিরোধিতার তত্ত্ব (anti science) কিছু অনুধাবন করা দরকার।

ভাষা, দূরত্ব

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ার আন্দোলনকে মানুষের কাছে ঠিকঠাক নিয়ে যেতে গেলে বিজ্ঞানের বোধটুকু ছাড়াও মানুষের ভাষাটা জানা চাই। 'ল্যাংগোয়েজ' নামক ভাষার কথা বলছি না, বলছি সাধারণ মানুষের মনকে স্পর্শ করার ভাষা, যোগাযোগের ভাষা। বলার বিষয়, ঢঙ, শব্দচয়ন, প্রকাশভঙ্গি, অন্তরঙ্গতা, উচ্চারণ এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কাজের সাফল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে। এ বিষয়টি সক্রিয় কর্মীরা প্রাথমিক গুরুত্বের বলে মনে করে বলে মনে হয় না। 'গ্ল্যামার'ওয়ালা ব্যক্তিত্ব, প্রাজ্ঞা ব্যক্তি, উচ্চমানের বিশেষজ্ঞ, আত্মগর্বী নেতা—'এনাদের সঙ্গে সাধারণের দূরত্ব আছে, থাকবে, আমরা জানি। কিন্তু মাঠে ময়দানে রাজপথে পার্কে সভাগৃহে "বক্তব্য রাখতে" গিয়ে অধিকাংশ উৎসাহী গণকর্মীরও ভাষা হয়ে যায় যান্ত্রিক। উদ্দীপিত শিরা ফোলানো কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে লিফলেট-হ্যান্ডবিল-শ্লোগানের ভাষা—শ্রোতার কানে শব্দমণ্ডলী ঘুরপাক খায়, মনে মধ্যে ঢোকে না। আর বক্তা তার 'জ্বালাময়ী' বক্তব্য রাখার পর পরিতৃপ্তিতে চোখ বোজে, তার চোখ পড়ে না অতৃপ্ত শ্রোতার মুখ। এতে একজন তোতাবুলি আওড়ানো পার্টি ক্যাডারের কিছু এসে যায় না, কিন্তু একজন আদর্শ-নিষ্ঠ সৎ গণবিজ্ঞানকর্মীর কাছে শ্রোতার অতৃপ্তি ভীষণভাবেই এসে যায়, এসে যাওয়া উচিত।

লড়াকু কর্মীদের আরেকটি প্রবণতা হলো—পুরনো 'ভাষা'কে অতিরিক্ত ভালোবেসে ফেলা। যেসব ঝাঁঝালো শব্দ, 'জার্গন', বাক্যাংশ বা উদ্ধৃতি সত্তরের দশকে চলতো, নব্বুই-এর দশকের শেষে তা চলে না। এগিয়ে চলা সময়ের সঙ্গে ভাষাকেও তাল রাখতে হবে। বর্তমান প্রজন্ম কিংবা আগের প্রজন্মের প্রবীণেরা পুরনো রাজনীতির রং-লাগানো বাণী আর শুনতে চায় না; নবীনেরা বিরক্ত হয়, প্রবীণেরা ক্লান্ত বোধ করে। প্রাণ ঠেলে কাজ করা অনেক বিজ্ঞানকর্মী এই বিচ্ছিন্নতার কারণটা অনেক সময় ধরতে পারে না, হতাশ বোধ করে।

ছুঁৎমার্গ

এ এক ক্ষয়রোগ—বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠনগুলির মধ্যে ভাইরাসের মত ঘোরে। এই বাংলায় সত্তরের দশকের দুর্দান্ত আত্মত্যাগী বৈপ্লবিক জোয়ার ফেলে গেছে কিছু বর্জ্য, যার মধ্যে একটি হলো—শিবির তন্ত্র। লোকটির কথা শোনা বা কাজ দেখার আগেই সে কোন্ শিবিরের লোক সেটা খুঁজে বার করায় প্রবল তৎপর হতে দেখা যায়। যেন আন্দোলনের লক্ষ্যটি বড় নয়, ব্যক্তিটির পোষাকের রং-টাই বড় (যা প্রায় সব ক্ষেত্রেই অবৈজ্ঞানিকভাবে ধরে নেওয়া)। এই ছুঁৎমার্গ ছোট দলকে আরো ছোট করে। খেয়াল রাখা দরকার—বিজ্ঞান কোন ব্যক্তি বা দল বা প্রতিষ্ঠানের শর্তে আবদ্ধ নয়। তাই যুক্তিবাদী গণবিজ্ঞান আন্দোলনে কর্মসূচীর মূল বিষয়টিই (cause) প্রধানতম বিচার্য হওয়া উচিত। এই মূল লক্ষ্যের সপক্ষে যে-কোন জনমুখী সংগঠন যে-কোন ব্যাপার নিয়েই আসুক না কেন (বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষরা সপক্ষে আসবে না। কৌশল করতে এলেও তাদের চিনে নেওয়া যাবে) তাদের সবাইকে সামিল করতে পারলে অভীষ্ট লক্ষ্য-পূরণ সুনিশ্চিত করা যাবে। "স্বকীয় চরিত্র" অত ঠুনকো জিনিস নয়; সেখানে ভেজাল না থাকলে শুধু ছুঁৎমার্গ নিয়ে

অমুকবাদী তমুকবাদীদের আলাদা করার পরিণতি কত ক্ষতিকারক হয়, কত ধ্বংসাত্মক হয়, তা অতীতে বারবার দেখা গেছে। আমরা কি সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিচ্ছি?

উপসংহার

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তিকামী শক্তি এখনো ছড়ানো ছিটানো রয়েছে অন্ধকারে জোনাকির মতো। একত্রিত না হলে মুক্তির আলোর পথ দেখা যাবে না। বর্তমান সমস্যা সংকটে সামাজিক বা মানবিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সকলেই বারবার অনুভব করছেন যে, বর্তমান গোটা ব্যবস্থাটা পাল্টানো দরকার। কিন্তু সে তো এখুনি হবার নয়। পথটা অস্পষ্ট, কখনো শুধুই আঁধার। প্রবল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সংঘবদ্ধ শক্তি ছাড়া কায়েমী কাঠামোর গায়ে ফাটল ধরানো যাবে না। আপাতত যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞান-মানবিকতা নির্ভর গণ-আন্দোলনকে (People Science movement) এক পরিপূরক চেতনা বিকাশের শক্তি হিসেবেই এগোতে হবে। আপাত বিচ্ছিন্ন কর্মসূচী হলেও তা সংগঠনগুলির সাধ্য অনুযায়ী চালানো দরকার ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজ হিসেবে। আপন দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকলে বৃহত্তর সংঘবদ্ধ শক্তির স্বপ্ন ক্রমশ বাস্তবের কাছাকাছি আসবে।

এবং এরই সঙ্গে, চারপাশের এই নিরাসক্ত নিষ্ক্রিয় বাতাবরণের মধ্যেই সার্বিক মানববিকাশ ও সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট মতাদর্শগত ভিত্তি রচনার কাজ চালাতে হবে। কাজটা কঠিন, কিন্তু অপরিহার্য। আজ শুরু না করলে কবে এর সম্পূর্ণতা আসবে কেউ জানে না। আর পদ্ধতি? পথে নামলে পথ চলতে চলতেই ভিত্তি-দলিল রচনার কর্মপদ্ধতিও নির্ধারিত হয়ে যাবে। কেবল প্রতিজ্ঞাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার অম্লান প্রাণে।

(চেতনা গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা স্মারকগ্রন্থ ১৯৯৮-৯৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত) **উ মা**

মরণোত্তর চক্ষুদান

শ্রীরামপুর সেবাকেন্দ্র ও চক্ষু ব্যাঙ্ক মরণোত্তর চক্ষু সংগ্রহে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাদের বাৎসরিক সংগ্রহের তালিকা— ২০০৯-এ ১৪২, ২০১০-এ ১৬৮ ও ২০১১-য় ২২৮।

তৃতীয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য। জীবনানন্দ সভাঘরে।

গত ২০ নভেম্বর ২০১১ জীবনানন্দ সভাঘরে 'উৎস মানু' তৃতীয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে। বিগত বক্তৃতা সভাদুটি শুরুতে সারিন্দা ও বাঁশি বাজিয়ে শোনান দুই শিল্পী। এবারের শুরুটা ছিল অন্যরকম। গণসংস্কৃতি কেন্দ্র চেতনা, হাতিবাগানের বিজ্ঞান মেলা উপলক্ষ্যে নির্মিত অডিও ভিস্যুয়াল 'অজানা আন্দামান' থেকে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্যপাঠের নির্বাচিত অংশ শোনানো হয়। আমন্ত্রিত বক্তা রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য 'ঘাড় কামড়ে থাকা নিরক্ষরতা ও আমাদের অবদান' বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। শ্রোতাদের নানান প্রশ্নের উত্তরও দেন তিনি। অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো।

নিরক্ষরতা দূর করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য

তৃতীয় 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হয়েছিল গত ২০শে নভেম্বর, ২০১১। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন অধ্যাপক রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য। বিষয় ছিল 'ঘাড় কামড়ে থাকা নিরক্ষরতা ও তার অবদান'। সেই ভাষণটি উৎস মানুষ-এর পাঠকদের জন্য এখানে মুদ্রিত করা হল।

উৎস মানুষ-এর বন্ধুদের আমাকে এখানে বলবার সুযোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। দেশে অনেক গুণী মানুষ আছেন, তা সত্ত্বেও আমাকে কেন বেছেছেন সেই জিজ্ঞাসা আমার মধ্যে খচখচ করছিল। সুজয়বাবুকে আমি আগে দেখিনি। গতবার তাঁর বক্তৃতায় আসতে পারি নি। আজ সুজয়বাবুকে দেখে কী মাপকাঠিতে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার বক্তা নির্বাচিত হয় সেটা বোঝা গেল। পক্বকেশ সংক্রান্ত কুসংস্কারে আমাদের নির্বাচক বন্ধুরা আক্রান্ত হয়েছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু বারবার পক্বতার নিচে ঘিলু না-ও পেতে পারেন। এই সতর্কবার্তা প্রথমেই দিয়ে রাখলাম।

অশোকবাবুকে নিয়ে দু-একটা কথা আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। অশোকবাবুকে আমি দেখি প্রথম ১৯৮৬ সালে এক সন্ধ্যায়। উৎস মানুষের কোনো এক বন্ধু আমাকে বলেন অশোক আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছেন। গেলাম কলেজ স্ট্রীটের সেই গলিতে। ফুলুরির গন্ধ, বই ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ডিঙিয়ে ঘুরপাক খেয়ে সেই স্বল্প পরিসরের লম্বা ঘরটির সামনে দাঁড়ালাম। ভেতরে ব্যস্ততা, দু-একটা ছোটখাট তর্কযুদ্ধ চলছে। বুঝতে চাইছি কে অশোকবাবু! হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। নিমেষে মোমবাতি জুটিয়ে আবার কাজ চললো। অশোকদ্বাবুর সঙ্গে কথা হলো কিন্তু অন্তরঙ্গতার সময় হল না। তিনি নানা চাপে খুব ব্যস্ত ছিলেন। এরপর আমার জীবনের নানা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যোগাযোগটা অশোকবাবুই রাখলেন। নব্বুইয়ের দশকে যখন উৎস মানুষ বন্ধ হয়ে যাবে যাবে---পাঠক প্রচুর, লেখাও খুব ভাল বেরোচ্ছিল কিন্তু ব্যবস্থাপনার অভাবে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়—সেই সময় তাঁর যাতনার সাক্ষী আমি। সে সব কথা এখানে বলতে ভালো লাগতো কিন্তু আজ সেই কাজ নয়। আমি যেভাবে অশোকবাবুকে বুঝেছি সেটা বলি। বিজ্ঞানকর্মীদের দুটো কাজ। এক বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া দুই মানুষকে বিজ্ঞানের কাছে নিয়ে আসা। দুটো পরস্পরের সম্পর্কিত, কিন্তু পৃথক কাজ। বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার কাজটা বাঙালিরা করেছেন অনেকদিন ধরে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এরকম বড় বড় মাথাও এ কাজে লেগেছিল। দ্বিতীয় কাজটাতে মাঠঘাটের কর্মবীরদের চাই। সেটা আমরা কালেভদ্রে পেয়েছি। ফলে এ কাজটা এ'দেশে একটু উপেক্ষিতই থেকেছে। অশোকবাবু ও তাঁর দলবল দ্বিতীয় কাজটাকে, অর্থাৎ মানুষকে বিজ্ঞানের কাছে নিয়ে যাওয়াকে খুব তোল্লাই দিলেন এবং বহুদিন ধরে দুটো কাজের মধ্যে অগ্রাধিকারটা খুব সুচিন্তিতভাবে adjust করলেন। বন্ধুরা উৎস মানুষের শেষের পাতাটার কথা একটু মনে আনুন সে সঙ্গে সংগঠনগুলো নিয়ে অশোকবাবুর স্নেহপ্রবণ গল্পগুলোও একটু মনে করে নিন। এই বিষয়টাতে আলোচনার শেষপ্রান্তে আমাকে ফিরতে হবে।

এবারের বিষয় 'ঘাড় কামড়ে থাকা নিরক্ষরতা ও আমাদের অবদান'। এর মধ্যে 'অবদান' শব্দটা নিয়ে একটু জিজ্ঞাসা জাগতে পারে। আমাকে বহু বছর আগে প্রবোধ সেন মশাই বলেছিলেন 'অবদান' কথাটা কনট্রিবিউশন বা কীর্তি অর্থে হয় না। তারপর খুঁজে পেতে দেখলাম 'অবদান' কথাটা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে নিজ শব্দসামর্থ্যে নেই। অবদাত বলে একটা শব্দ আছে। তবে রাজশেখর বসু মশাইয়ের চলন্তিকায় 'অবদান' আছে। আমার সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্ব না-জানা-মন বলছে 'অবদান' একটা সন্দেহজনক শব্দ। এর অর্থ কীর্তিও হতে পারে আবার অপকীর্তিও হওয়া সম্ভব। সাক্ষরতার ব্যাপারে আমরা কী করেছি সেটা আমি বলছি;—আপনারা বিচার করে দেখবেন অবদান কথাটা এ ক্ষেত্রে জুতসই হোল কি না!

আমরা যখন স্বাধীন হলাম তখন আমাদের সাক্ষরতা ছিল ১৬ শতাংশ। ১৯৫১ সালে গিয়ে দাঁড়ালো ১৮ শতাংশে। ১৯৫১ থেকে যদি পিছিয়ে যাই, তবে ১৯৩১-এ ৮ শতাংশ; আরও একটু পিছিয়ে গেলে ১৮৯১-এ ৬ শতাংশ। ঐ সময়টাতে অনেক ভাবুকই লোকশিক্ষায় গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। আমি সে ইতিহাসে পুরোপুরি যাব না শুধু মোটা কথাগুলো বলে প্রবণতাটা বুঝতে চেষ্টা করবো। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, বঙ্গদেশে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ আছে, কিন্তু বাঙালিকে দিয়ে কোনও কাজ হচ্ছে না। কেন? কারণ বলছেন, লোহাকে ইস্পাত করার মতো মানুষকে প্রস্তুত ও শিক্ষিত করা হচ্ছে না—বাঙলায় লোকশিক্ষা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলছেন, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের জন্য জাতিভেদ দায়ী। তারপর বলছেন, জাতিভেদ ব্যাপারটা দিন-দিন কমছে কিন্তু

শিক্ষাভেদ ও সম্পত্তির প্রভেদ আমাদের দুর্দশার বড় কারণ হয়ে উঠছে। এটা ১৮৭২ সালের কথা। কাছাকাছি সময়ে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই একটা বিদ্যাপীঠ করেছিলেন বরানগরে চটকল শ্রমিকদের লেখাপড়া ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস শেখানোর জন্য। উত্তরপাড়ায় ভূস্বামীরা কোলকাতায় খ্রিস্টান সেবিকারা চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন মৈত্রের দলবল, রবীন্দ্রনাথের দিদিরা ব্রাহ্মসমাজের আরও দু-একজন তারপর চেষ্টা করছিলেন। বিরাট দেশে খুব ক্ষীণ পরিসরে এসব চেষ্টা চলছিল। কালীমোহন, পিয়ার্সন, অমর্ত্য সেনের সাইকেলে করে গ্রামে যাওয়া, বিভার সাহেব ও বিনয় সরকার মশাই বই লিখেছেন, বিজ্ঞানভিক্ষুর জীবনটা এ কাজে দিয়ে যাওয়া এ দেশে চলেছে। কলকাতার বস্তিজীবন নিয়ে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতো ওরকম সদ্যসাক্ষরপাঠ্য বই কে আর লিখেছেন! এরকম আরও কিছু নাম করা যায়। কিন্তু অশিক্ষা আমাদের যতোবড় সমস্যা সেটাকে সামলানোর মতো ততোবড়, বা বলা যায় প্লাবনোচিত বাঁধনির্মাণ এ দেশে হয় নি। সমস্যাটা আমাদের চিন্তকেরা ধরেছিলেন ১৮৬০ সালের আগেই কিন্তু বড় সংগঠিত চেষ্টায় তাকে সামলাবার উদ্যোগ হয় নি।

বড় সংগঠিত উদ্যোগ বলতে আমরা এ ক্ষেত্রে রাশিয়া, কিউবা বা আজকাল চীনের কথা বলে থাকি। অমর্ত্য সেন মশাই প্যারিসে সাক্ষরতা নিয়ে এক বক্তৃতায় (Reflection on Literacy, 2002) জাপানের কথা বলেছেন। সেই বলা থেকে আমরা কী করতে পারলাম না সে কথাটা বেরিয়ে আসে। আমি অধ্যাপক সেনের লেখা থেকে একটু পড়ছি—"...in mid-nineteenth century the task (of basic education) was seen with remarkable clarity in Japan. The Fundemental Code of Education, issued in 1872 ... expressed the public commitment to make sure that there must be 'no community with an illiterate family nor a family with an illiterate person.' Kido Takayoshi, one of the leaders of Japanese reform explained the basic idea: 'Our people are no different from the Americans or Europeans today; it is all a matter of education or lack of education." (ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানে বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে লক্ষণীয়ভাবে একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়। ১৮৭২ সালে প্রণীত শিক্ষার মৌলিক বিধান জনগণের এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে গোষ্ঠীভুক্ত কোনও পরিবার বা পরিবারভুক্ত কোনও সদস্য যাতে অশিক্ষিত না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। জাপানের সংস্কারপন্থী এক নেতা কিডো টোকাওসি মূল ধারণার এই ব্যাখ্যা দেন যে 'আমেরিকান বা ইউরোপীয় জনগণের সঙ্গে আমাদের জনগণের কোনও পার্থক্য না থাকলেও শিক্ষা বা অশিক্ষার কারণে এদের মধ্যে ফারাক থেকেই যায়'।) এই প্রতিজ্ঞাসূত্রেই গরিব জাপানের ঘুরে দাঁড়ানো। কাকতালীয় কি না জানি না সালটা সেই ১৮৭২।

আমরাও জাপানের সমকালেই কর্তব্যটা বুঝতে পেরেছিলাম তবে পরাধীন দেশে সরকারিশক্তি নিয়োগের বা বলপ্রয়োগের অবস্থায় আমরা ছিলাম না। তবে বাঙালিরা চুপ করেও ছিলেন না। আমরা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দৃষ্টান্ত ধরে চাঁদা তুলে জেলায় ও গ্রামে স্কুল করেছি। আমরা ভেবেছিলাম স্কুল করলেই শিক্ষার কাজটা হবে। প্রচুর স্কুলে-না-যাওয়া বা স্কুলছুট শিশু চারিদিকে যে নিরক্ষরের প্লাবন ঘটাচ্ছে সেটাতে আমাদের অনেকেরই নজর পড়ে নি। সাক্ষরতার কাজে ভাল করে হাত না দেবার অপরাধে আমরা অপরাধী। এমনকি দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ঐ অপরাধ আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয়দের বেশি। ১৯৫১ সালের গণনায় সাক্ষরতায় কেরলের ৪০ শতাংশের পরেই পশ্চিমবঙ্গ ছিল ২৪ শতাংশ নিয়ে। রাজ্যদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। এখন (২০১১ গণনা) কাগজে সবাই পড়েছেন যে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট এমনকি ত্রিপুরাও পশ্চিমবঙ্গকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এসব নিয়ে পারস্পরিক খুব দোষারোপ হয় কিন্তু কেউ তেড়েফুঁড়ে একটা বড় কাজ ধরেন না। তেমনি ভারতের অবস্থাও সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় ভয়ঙ্কর। ইউনেস্কোর শেষতম (২০১১) গ্লোবাল মনিটারিং রিপোর্টে বেরিয়েছে যে পৃথিবীর বয়স্ক (১৫+) নিরক্ষরের ৩৫ ভাগই ভারতবাসী। ২০০১ সালের গণনায় ৩৬৫টি জেলায় অর্ধেকের বেশি বয়স্ক (১৫+) নারী নিরক্ষর ছিলেন। ২০১১ সালের প্রবণতার স্পষ্ট যে, সে জেলার সংখ্যা এবারো ৩০০ থেকে নিচে নামবে না। ২০০১ সালের গণনায় কিষাণগঞ্জ জেলায় বয়স্ক নারী নিরক্ষরতা ছিল ৮৫ শতাংশ, মালকানগিরিতে ৮৪, গিরিডিতে ৮০, আমাদের পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদে ৭০, এ হল দেশের অবস্থা।

তবে এখানেই দীর্ঘশ্বাসটা ফেলবেন না। কারণ দুর্দশার নিম্নরেখাটা আরও নিচে। আমাদের জনগণনায় সাক্ষরতার মানটা আমরা নামিয়ে ধরেছি। কোনো কাজে লাগে না এরকম লেখাপড়াকেও আমরা সাক্ষরতা বলছি। জনগণনার মানদণ্ডটা হল, যে ব্যক্তি যে কোনও ভাষায় বুঝতে, লিখতে ও পড়তে পারেন তাকে সাক্ষর বলে বিবেচনা করতে হবে। সেই সঙ্গে বলা আছে শুধুমাত্র নামসই করলে সাক্ষর বলা যাবে না। গণনার এই মানকে সাক্ষরতার লোকেরা যথোপযুক্ত বলে মানেন না। ১৯৫১ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত মনে করা হোত functional literacy হচ্ছে সাক্ষরতার নিম্নতম মান্যসীমা। ব্যক্তিকে নিজের ও সমাজের প্রগতির প্রয়োজনে যত কাজ করতে হয় তা করবার মতো পড়বার, লিখবার ও অঙ্ক কষার দক্ষতা থাকলে তবে functional literacy অর্জিত হয়েছে বুঝতে হবে। এটা জনগণনার সীমা থেকে অনেক উচ্চস্তরের দক্ষতা। তবে এখন functional literacy-কেও সাক্ষরতার মান্যসীমা বলতে ভাবুকেরা ইতস্তত করেন।

জমতেইন কনফারেন্সের পর এখনকার কথাটা হল lifelong education for all । কারণ চতুর্দিকে সব দ্রুত বদলাচ্ছে তাই ক্রমাগত শিখে যাওয়া ও সেই শিখনের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। রাষ্ট্র সেই ব্যবস্থা করবে for all, এটাই আজকালকার শিক্ষাসভ্যতা। ভারত সরকারও 'lifelong education for all' ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। তার পরেও জমতেইনে প্রশ্ন উঠলো যে স্পষ্টতার জন্য শিক্ষার (ওঁরা বলেছেন basic education) একটা মান্যসীমা দরকার। অর্থাৎ কতটা কমপক্ষে সূচনাস্তরে হতেই হবে। বা চিরজীবনের শিক্ষার দৌড়টা কোন প্রাথমিক রেখা থেকে শুরু হবে। ঠিক হল সেটা হবে অষ্টম শ্রেণীর সমমান। এই বিধি সীমাটা আমাদের জনগণনায় এখনো মানা হচ্ছে না। ফলে বয়স্কশিক্ষাবিদেরা যাকে সাক্ষর বলেন তার থেকে নিচু মানের মানুষ আমাদের দেশে সাক্ষর হয়ে বসে আছেন।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে ঐ আদর্শ মান অনুসারে আমাদের আদত হারটা এদেশে কী? অষ্টম শ্রেণীর মান পেরোনো মানুষ দেশে কতজন সেই তথ্যটা জরুরি কিন্তু বের করা বেশ কঠিন। দেশবাসীর শিক্ষার মান বের করবার জন্য একটা ভালোরকমের এডুকেশান সার্ভে করা আমাদের প্রয়োজন। সেটা সরকার করছে না। তবে NSSO-র একটা ডেটা আছে। স্যাম্পল সার্ভের ৬৩ রাউন্ডে (২০০৬) মাধ্যমিক পাসওয়ালাদের তথ্য পাচ্ছি। অষ্টম শ্রেণী পাচ্ছি না। সে তথ্যে আমাদের দেশে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ মানুষ গ্রামে ১১.৬ শতাংশ, শহরে ২৩.৯ শতাংশ। এই দুটো তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, ২০০৬ সালে এদেশে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ মানুষ ছিল ১৫ শতাংশের আশেপাশে। এবার অনুমান করুন অষ্টম শ্রেণী মানে কতজন: ২০? ২৫? নাকি ১৫ থেকেও কম! কারণ অনেক শিক্ষাশাস্ত্রী বলেন, অষ্টমশ্রেণীর মানে না পৌঁছেও অনেকেই মুখস্থের জোরে আজকাল মাধ্যমিক পাস করে ফেলছেন। সে বিতর্ক জরুরি, কিন্তু আপাতত তোলা থাক। মোদ্দা কথা, ২০১১ সালের গণনায় দাবি করা হয়েছে, এদেশে শতকরা ৭৭ জন সাক্ষর। সেটা সাক্ষরতার আদত হার নয়। আদত হার অনেক নিচে। লোকশিক্ষার তথ্য এদেশে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে আমরা নিশ্চিন্তে যেতে পারি।

এখানে একটু বলে নিই: আমাদের বন্ধুদের মনে একটা প্রশ্ন জাগছে—আমরা বিজ্ঞানকর্মীরা সাক্ষরতার সমস্যা নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন হব, সে বিষয়টি তাঁরা সুস্পষ্ট করতে চান। এবার আমি এই জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গে যাই, কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশমন্ত্রী মহাশয় দিল্লিতে, সম্ভবত কোনো পাঁচতারা হোটেলে, সমাসীন ভদ্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'এদেশে গ্রামে ৬০ শতাংশ নারী এখনো প্রাতঃকৃত্য করতে মাঠে যায়। ছি ছি, কী দুর্দশা দেশের!' আমাদের দুর্ভাগ্য মন্ত্রীমশাই দুর্দশার তথ্যটা ঠিক জানতে পারেন নি। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভের (২০০৬) শেষতম নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা বলছে এদেশে ২৫ শতাংশ গ্রামীণ গেরস্থালিতে মাত্র ল্যাট্রিন আছে। তার অর্থ কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ নারী ২০০৬-এ মাঠে যেতেন। মন্ত্রী ও তাঁর তথ্যবিভ্রাট আপাতত থাক। প্রশ্ন, এই বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনো কেন মাঠে যাচ্ছেন? তাঁদের কি অন্য উপায় জানা নেই? পরিবেশ, রোগমুক্তি ও লাজলজ্জার খাতিরেও কি তাঁরা শৌচাগারমুখী হবেন না? ১৯৮৬ সালের জানুয়ারি সংখ্যার উৎস মানুষ-এ এক লেখক এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গের এক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। সেখানে ইউনিসেফের টাকায় মাঠে যাওয়া ৩৫টি গ্রামে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা ৩৫টি শৌচাগার বানানোর প্রসঙ্গ বলা হয়েছিল। তখন দেখা গেছিল সেখানে ৯০ শতাংশ গ্রামে কেউ সেই শৌচাগার ব্যবহার করলেন না। তারপর সেই গ্রামে আন্ত্রিক হল, অনেক শিশু মরলো, মানুষ চোখের সামনে মল-জল-আন্ত্রিক-মৃত্যু এই চক্রকে দেখতে পেলেন, তবু শৌচাগারে গেলেন না। লেখক তারপর গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানিয়েছেন এই পরিহারের পেছনে গ্রামের নিজস্ব পরিচ্ছন্নতাবোধ, ধর্মীয় ছোঁয়াছুয়ি, প্রবল কু-অভ্যাস-নির্ভরতা এ সব ছিল, তবে মূল প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখলেন অশিক্ষাকে। দেখলেন অশিক্ষা নতুন যুক্তি যাবার পথ বন্ধ করে রেখেছে। বয়স্ক নারীদের (১৫+) অশিক্ষা সেখানে তখন ৮১ শতাংশ। এই ঘটনার উল্টোচিত্র আমরা দেখতে পেলাম তমলুকে। সেখানে ইউনিসেফ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও পঞ্চায়েতের ত্রিমুখী উদ্যোগে একই প্রকল্প প্রায় ১০০ ভাগ সার্থক হল। কেন? কারণ সেখানে শিক্ষার হার ৮০ শতাংশের বেশি। বিজ্ঞানের যুক্তি ও স্বাস্থ্যের তথ্য বোঝাতে সেখানে ছোট পুস্তিকা, প্রচারপত্র, পোস্টার ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অনেক সুবিধা করে দিল। নিরক্ষরতা নানা বিপদ ডেকে আনে এ কথাটা যেমন সত্যি তেমন সত্যি অমর্ত্য সেন মশাই যা বলেন—নিরক্ষরতা itself একটা বিপদ। সে বিজ্ঞানবিমুখী সমস্ত গতানুগতিক বিশ্বাসে অভ্যস্ত একটা অন্ধ আক্রমণাত্মক মানসিকতা তৈরি করে রাখে। মানুষের কাছে তথ্য নিয়ে যেতে বা মানুষকে তুলনা করতে বা সামনে তাকাতে সে নিষেধ করে। স্কুলে নিরক্ষর পরিবারের শিশুকে হাত ধোয়া শেখানো যাচ্ছে না, কারণ বাপ গামছায় হাত মুছে ভাত খায়। পরিবারের সবাই কৃমির ঔষধ কেন খাবে? আমার ছেলের কৃমি, আমি কেন বড়ি খাব? নিরক্ষর মায়ের সন্তান বেশি হয়, সন্তান বেশি মরে, সে নিজে বেশি মরে। বাল্যকালে বিবাহিত হয় ও সারাজীবন অপুষ্টিতে ও দারিদ্র্যে ভোগে এসব আজকাল প্রমাণিত সত্য। ফলে নিরক্ষরতাকে ও অশিক্ষাকে না নাড়িয়ে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ধারণা ঢোকানো যাবে বলে মানতে পারি না।

এ অবস্থায় কর্তব্য কী সে কথা এখানে সংক্ষেপে একটু বলব। তার আগে বর্তমান দশাটা আর একটু বলে নিই। পরাধীন দেশ

স্বাধীন হবার পর সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আমাদের 'অবদান'টা একটু দেখে নিই। আমরা বলেছি, এ দেশ স্বাধীন হল ৮৪ ভাগ নিরক্ষর নিয়ে। তারপর ১৯৭৭ পর্যন্ত যত পরিকল্পনা হল তাতে ঐ ৮৪ ভাগের জন্য প্রায় কোনো উদ্যোগই ছিল না। মোট শিক্ষা বরাদ্দের ২ শতাংশেরও কম টাকা এ সময় ব্যয় হয়েছে বয়স্ক শিক্ষায়। ১৯৭৭ সালে প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র উদ্যোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বয়স্ক শিক্ষা বিভাগের পত্তন করলেন। আজও কোনও একটি বছরে মোট শিক্ষা বরাদ্দের দশ শতাংশের বেশি টাকা বয়স্ক শিক্ষা খাতে এ দেশ খরচ করে নি। ইউনেস্কোর গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে (০৭-১১) বারবার বলা হচ্ছে, এশিয়াতে ভারত একমাত্র দেশ যারা শিক্ষাখাতে খরচ কমাচ্ছে। সেই কম বরাদ্দের [এখন (২০০৯) GDP-র ৩.৩ শতাংশ] জগতে দুয়োরানী হচ্ছে সাক্ষরতা। অনক্ষরতার সমস্যাটিকে অবহেলা করাটা স্বাধীন ভারতের সর্বোত্তম প্রগতিবিরোধী অপকর্ম বলে আমার বিশ্বাস। আমরা দীর্ঘকাল এই কর্মের ফলভোগ করব। কোনো গ্রোথ রেট, কোনও IIT, কোনও শিল্পোত্থান ঐ দুর্গতি থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বর্তমান দশায় মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নানারকম ঢক্কানিনাদযুক্ত ছোট ছোট প্রকল্প এ দেশে সরকার চালিয়েছে। যেখানে সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা সমান গুরুত্ব দিয়ে চালানো প্রয়োজন—যেমন চীন করেছে। সেখানে সাক্ষরতার জন্য ছোটখাটো প্রজেক্ট সরকার এদেশে বারবার চালিয়েছে। বর্তমানে যেমন চলছে সাক্ষর ভারত প্রজেক্ট। এই প্রকল্পে বলা হচ্ছে ৩০০ ঘণ্টা পড়িয়ে একজন নিরক্ষরকে সরকার সাক্ষর করে দেবে। এই ঘণ্টাটা ৩০০ কেন? কোনো জবাব নেই, কারণ কোনো গবেষণায় এই সময়সীমা মেলে নি। এই ৩০০ ঘণ্টাটা একটা আমলাতান্ত্রিক আন্দাজ। সরকারের দুরাশা, দেশের ৩৬৫ জেলায় যুবক-যুবতীরা বিনে মাইনেতে স্বেচ্ছাশ্রমে এই ৩০০ ঘণ্টা পড়িয়ে দশ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করবেন। সে প্রত্যাশায় পড়ানোর জন্য কোনো অর্থ এ প্রকল্পে বরাদ্দ হয় নি, সরকার খরচ বাঁচিয়েছেন। যে দেশে মন্ত্রীদের নামে প্রত্যেকদিনই একটা করে পিলে চমকানো সততার বৃত্তান্ত বেরোচ্ছে সেখানে যুবকদের অতটা স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়া অসম্ভব এ কথা নাই বললাম। কিন্তু ঐ মন্ত্রীদের ডাকে সেটা হওয়া কি আদৌ সম্ভব? জোড়াতালি দিয়ে তাড়াহুড়ো করে অনক্ষরের পিঠে সাক্ষরতার ছাপ দিয়ে ভোট ম্যানিপুলেশান করা এ সব উদ্যোগের লক্ষ্য নয় কি? একই কাণ্ড চলছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে—কিছুমাত্র না শিখিয়ে কোনো ক্রমে অষ্টম শ্রেণী ডিঙিয়ে দেওয়া।

আমরা একটু আগেই 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'-র কথা বলেছিলাম। শিক্ষা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। সাক্ষরতার ওস্তাদেরা বলেন, গ্রামে গ্রামে ও বস্তিতে বস্তিতে বয়স্ক শিক্ষার পাকাপোক্ত পাঠকেন্দ্র খুলতে হবে। সেখানে ভালো প্রশিক্ষণ পাওয়া কর্মী দিতে হবে। অসাক্ষর মানুষ লেখাপড়ার সুফল সবসময় বুঝতে পারেন না। বলেন, আমাদের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে যেতে ইচ্ছে করে না, গেলেও বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। তাঁরা শিখতে চান উপার্জনী দক্ষতা, স্বাস্থ্যবিধি। দারিদ্র্যমুক্তি তো চানই কিন্তু সে ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। এ অবস্থায় কাজটা খুব কঠিন হয়ে গেছে। ঐ কেন্দ্রের দরজা এমনভাবে খোলা রাখতে হবে যাতে মানুষ সেখানে নিশ্চিন্তে যেতে পারেন, তাঁর সারাজীবনের শিক্ষার ও জানবার যোগটাতে নির্ভর করতে পারেন। কর্মশিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতায় ও নতুন উপার্জনে যাবার একটা পদ্ধতি আছে সেটার প্রয়োগ অদীক্ষিত কর্মীর পক্ষে অসম্ভব। স্বয়ম্ভর দল থেকে প্রশিক্ষণ, সাক্ষরতা, উৎপাদন ও বাজারের পথটাও কঠিন। এসব পথ বা আলোচনা করে অন্য পথ চলার উপায় সেখানে করতে হবে। কাজ যেখানে কঠিন সেখানে ছোট করে শুরু করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা একটা জেলা, এমনকি একটা সাব-ডিভিশন দিয়ে শুরু করতে পারি। বিজ্ঞানকর্মীরা ৫টি পরিবার নিয়ে শুরু করুন। যেখানে নামব সেখানে সর্বশক্তি প্রযুক্ত হোক। ঐ ৫টি পরিবার বা একটি জেলায় কাজ করতে গিয়ে যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা হবে তা নিয়ে আবার একটু বড় এলাকায় যেতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার দুর্গতি দূর করবারও বোধকরি ওটাই এখন উপায়। একটা নাছোড়বান্দা একগুঁয়েমিপনা চাই। চীনে এ কাজ সম্ভব হয়েছে, কারণ ওরা অত্যন্ত বাস্তববোধসম্পন্ন ও নাছোড়বান্দা জাতি। প্রথমেই চীনারা বুঝে নিয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষা দুটোকেই জাপটে ধরে টেনে তুলতে হবে। বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্রে ওরা মাস্টারদের তো মাইনে দিয়েছেনই এমনকি যারা পড়ুয়া তাদের পাঠকালীন মজুরিও রাষ্ট্র থেকে পুষিয়ে দিয়েছে। ১৯৯০-২০০১ সালের মধ্যে চীন প্রায় দশ কোটি মানুষকে সাক্ষর করেছে। দু-একজন বিশেষজ্ঞ এসব হিসেব নিয়ে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তবে চীনে গেলে দেখা যায়, আমাদের দেশে যেমন পাড়ায় পাড়ায় পার্টি অফিস, চীনে তেমন গাঁয়ে গাঁয়ে বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্র। নতুন নতুন দক্ষতা তৈরি করবার জন্য প্রচুর সচিত্র বই লিখেছে ওরা। পাঠকেন্দ্রে সে-সব বই সারি দিয়ে সাজানো। এক-একটা বই খুললেই বোঝা যায়, অনেক পড়ুয়া সেটা পড়েছে। ওদের সমস্যা লিপি নিয়ে। গ্রামাঞ্চলে ১৫০০ চিত্রলিপি শিখতে হয় ওদের। সাক্ষর হতে এই কঠিন সমস্যা সামলাতে নানা উদ্ভাবনী পন্থা, বিচিত্র সব উপকরণ ওরা স্থানীয়ভাবেই বের করেছেন। প্রচুর Learning Songs ব্যবহার করেছেন। একটা গান করতে করতেই একটা নতুন কৃষিদক্ষতা অধিগত হয়ে গেল। দেশের পূর্বাঞ্চলে কাজটা শেষ করে তবে ওঁরা থেমেছেন। পশ্চিম-উত্তরে এখনো অনক্ষরতা আছে।

অধ্যাপক ভোলা সত্তর দশকের শেষদিকে ইউনেস্কোর হয়ে রাশিয়া গেছিলেন সাক্ষরতার কাজের মর্ম উপলব্ধি করতে। তিনি তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, রাশিয়াতে পলিটিক্যাল উইলটা ছিল

সবথেকে বড় সহায়কশক্তি। আমাদের দেশে রাজনৈতিক ইচ্ছেশক্তির অনুপস্থিতিটা হচ্ছে সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা। পশ্চিমবঙ্গে আমরা প্রায় দু-দশক আগে বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর সম্পূর্ণ সাক্ষর হয়েছে বলে হাত মুছে ফেলেছিলাম। ২০১১ সালের জনগণনায় দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের (০-৬ বছর বাদ দিয়ে) নিরক্ষরতার হার বীরভূমে ৩৬, বর্ধমানে ৩০, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৯। অন্যেরা কাজ করেন, আমাদের হালের বিদ্যাসাগরেরা কাজ না করেই ভোটের বাক্স ভর্তি করবার ফন্দি আঁটেন। পশ্চিমবঙ্গের যে মন্ত্রী এখন জনশিক্ষার দপ্তর চালনা করেন, তাঁর কী পরিকল্পনা, তিনি কী ভাবছেন, আমরা কেউ জানি না। যে দলের বা যে মতেরই হোক সরকারের দিকে তাকালে সাক্ষরতার কর্মীদের এদেশে বড় অসহায় বোধ হয়। সাক্ষরতার জন্য দিল্লিতে কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নেই, উদ্যোগ, পরিকল্পনা বা গবেষণাও নেই। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের দপ্তর বিষঘুমে ঝিমন্ত। অথচ সমস্তরকমের বিশ্লেষণ বলছে, এদেশে গরিব মানুষের শিখবার প্রতিষ্ঠান চাই। চাই বিদ্বানের সমর্থন, কর্মীর ধৈর্য ও বহুমুখী কর্মোদ্যোগ। দীর্ঘকাল ধরে এ কাজ আমাদের করতে হবে। কোনো ম্যাজিক নেই, কোনো শর্টকাটও নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, অনক্ষরকে যদি আমরা সাক্ষর ও সদা-শিখিয়ে না করতে পারি, তবে মানুষকে বিজ্ঞানের কাছে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে নিয়ে যাবার কাজটা কমবেশি তেলা মাথায় তেল দেওয়া হবে।

আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অনুগ্রহ করে এই আলোচনা শুনেছেন। আমার নমস্কার এবং বিষয়টি নিয়ে একটু উদ্যোগী হবার অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি।

চেতনার বিজ্ঞানমেলা

একটি প্রতিবেদন

চেতনা গণসাংস্কৃতিক সংস্থার (হাতিবাগানের চেতনা) উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি ২০১২ বিজ্ঞান মেলা হয়ে গেল। মেলার থিম ছিল 'বিজ্ঞান ও দেশপ্রেম'। 'অলৌকিক নয় ম্যাজিক' টেনেছে দর্শকদের। ছিল 'কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেটের অনুপ্রবেশ', 'কাচের ব্যবহারিক দিক' ইত্যাদি নিয়ে প্রদর্শনী। ধাঁধা নিয়ে প্রদর্শনীটিও বেশ মজার। মেলার মূল মঞ্চে হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে বাউল গানের বিষয় হয়ে উঠেছে 'ক্রেতা সুরক্ষা'। ছিল বইয়ের স্টল, মেদিনীপুর নয়াগ্রাম থেকে এসেছিলেন পটুয়ারা। উত্তর কলকাতার সাবেকি পাড়ায় এহেন মেলা সত্যি অভিনব। দেখতে দেখতে মেলার বয়স হল ২২। এই বাজারে এ ধরনের মেলা যে কীভাবে চলছে তা উদ্যোক্তারাই জানেন! একেবারে স্থানীয় উদ্যোগে চলে এ মেলা। এখনও থাবা বসাতে পারেনি চেতনার বিজ্ঞান মেলায়।

পাঠকের দরবারে, বিতর্ক

অ্যান্টিবায়োটিক কী নিরাপদ? তবে অনেকসময় রোগীর শরীরে অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া হয় কেন?

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার অ্যান্টিবায়োটিক কেন যে কোনও ধরনের আধুনিক ওষুধই (সোজা ভাষায় অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ) যথেষ্ট নিরাপদ। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত না হলে ছাড়পত্র দেওয়া হয় না। ওষুধের জগতে এই কথাটা এখন বহুল প্রচলিত যে, নিরাপত্তা সবার আগে; অর্থাৎ দেখতে হবে যাতে ওষুধ প্রয়োগের জন্য কোনও খারাপ কিছু ব্যাপক স্তরে না হয়। স্বাভাবিক ভাবেই যেহেতু কোটি কোটি লোকের মধ্যে ওষুধটিকে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করা আগের থেকে সম্ভব নয়, তাই আগের থেকে সুনিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয় যে অমুক ব্যক্তিটির তমুক কিছু খারাপ প্রতিক্রিয়া হবেই, বা কখনোই হবে না। তবে এ নিছক সংখ্যাতত্ত্বের খেলা, সম্ভাব্যতার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের কথাবার্তা।

অ্যান্টিবায়োটিক হল এক ধরনের ওষুধ যা জীবাণুকে সরাসরি মেরে ফেলে অথবা তার বৃদ্ধি প্রতিহত করে ভবিষ্যতের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, মানবদেহ আর জীবাণু, যা আসলে প্রাণী শরীরও বটে, মোটামুটি একই ধরনের রাসায়নিক উপাদানে তৈরি। তা হলে তো এই ওষুধে মানবদেহেরও ক্ষতি হবার কথা। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। মানবদেহের কোষের গঠন এবং জীবাণুদেহের কোষের গঠনে বেশ কিছু তফাত আছে। তাই অ্যান্টিবায়োটিকের মানবদেহের কোষ বৃদ্ধি বা তাকে মেরে ফেলার কোনও রকমই আশঙ্কা নেই। অ্যান্টিবায়োটিকের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়ে দিলেও মানবদেহে তার নিজস্ব কোনও ক্ষতিকর প্রভাব নেই। আর পাঁচটা অন্য যে কোনও ওষুধের মতনই এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। যে কোনও ওষুধই আসলে এক-এক ধরনের রাসায়নিক। আর জীবদেহে রাসায়নিকগুলির কিছু সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া আছে, যার জোরেই তো ওষুধের কার্যকরী ক্ষমতা। তাই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগে আলাদা করে আশঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই।

কাজে কাজেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া, শরীর দুর্বল, কমজোরি ইত্যাদি বিজ্ঞানের নিরিখে প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে অবশ্য বিশদে আলোচনাই শ্রেয়। ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে।

তাপস ভট্টাচার্য

আমরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠকের দরবারে কিছু বিষয় তুলে ধরব, যা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকবে। আর তা পত্রিকার পাতায় এবার থেকে ছাপা হবে। স.

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ—কার স্বার্থে?

আশীষ লাহিড়ী

১৯৩৩ সালে হতাশাগ্রস্ত এক তরুণ সংগীতবিদ প্রৌঢ় আইনস্টাইনকে লিখেছিল, আমি প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছি, মাঝে মাঝে আত্মহত্যাও করতে ইচ্ছে করছে। আপনি কোনো পরামর্শ দেবেন কি? উত্তরে আইনস্টাইন বলেছিলেন, সূক্ষ্ম সংবেদী মনের যারা অধিকারী, চারপাশের হতাশ্বাস পরিস্থিতির চাপে তাদের এরকম অবস্থা হওয়াটা খুব আশ্চর্যের নয়। তুমি একধার থেকে চিরায়ত সাহিত্য পাঠে মন দাও। দেখবে হয়তো এ ভাব কেটে যাবে।

আমার যদিও আত্মহতারে কোনো সাধ জাগেনি, তবু মনীষী-বাক্য স্মরণ করে আমিও মাঝে মাঝে পুরোনো কিন্তু চিরনতুন কিছু রচনা পাঠ করে থাকি, উপকারও পাই। সম্প্রতি আমাদের যৌবনকালের, মানে বিংশ শতকের ষাট-সত্তরের একখানি অবশ্যপাঠ্য বই আবার নতুন করে পড়লুম। পড়ে নতুন কিছু আলো সংগ্রহ করতে পারলাম। বইটি হল মাও সেতুংয়ের **'শিল্পসাহিত্য বিষয়ে ইয়েনান আলোচনা'**।

ইয়েনান ফোরামে মাওয়ের সমস্ত বক্তব্যের সারাৎসার হল: **কার স্বার্থে**? কোন্ কাজ কাদের কথা মাথায় রেখে করা হচ্ছে? আমার পাঠক কে? শ্রোতা কে? দর্শক কে? শত্রু কে? মিত্র কে? কে শত্রুপক্ষের দিকে ঝুঁকে আছে, আর কে আমাদের দিকে ঝুঁকে আছে? কাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, আর কাকে কাছে টানতে হবে, এবং কীভাবে? কার কাছে কোন্ পদ্ধতিতে পৌছনো সহজ? বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ প্রসঙ্গে এইসব প্রশ্ন আজ নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রথমত, এটা মানতে হবে, আমরা একটা নোংরা শোষকাকীর্ণ সমাজে বাস করছি যেখানে বিজ্ঞান সমেত যাবতীয় সংস্কৃতিই শোষক ও শাসকদের মুনাফালাভের স্বার্থে চর্চিত হচ্ছে। শোষক ও শাসকদের সংখ্যাটা ছোটো, কিন্তু তাদের ক্ষমতাটা, ক্ষমতার পাল্লাটা, বিশাল। সাধারণ মানুষের অনেকেই, হয়তো অধিকাংশই, না বুঝে এই নোংরা সমাজের নানান প্রচারে বিভ্রান্ত হন, অমৃত ভেবে হলাহল পান করেন। অল্প কিছু লোক আছে যাঁরা সচেতনভাবে ঐ চক্রের বাইরে, তাঁরা ব্যতিক্রম। বস্তুত সেই ব্যতিক্রমীরাই আমাদের ভরসা। প্রকৃত বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরাই, আবার তাঁরাই সেই জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যবস্তু। সুতরাং এখানে জনপ্রিয়করণ বলতে প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত সচেতন মানুষের বিজ্ঞানচেতনার মান বাড়ানোকেই বোঝাবে। বড়োজোর অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞানের মুখোশ খোলার কাজ বোঝাবে। যে-বিপুল সংখ্যক মানুষ না-বুঝে শোষক ও শাসকদের ফাঁদে জড়িয়ে আছেন, তাঁদের চেতনায় আত্মদীপ জ্বালানোর কাজটা খুব বড়ো আর খুব কঠিন কাজ। শুধু জনপ্রিয়করণ দিয়ে সে-সমস্যার সুরাহা হবে না। তার জন্য যে-প্রজ্ঞাবান রাজনীতি প্রয়োজন, তা থেকে আমাদের পথ অনেক দূরে গেছে বেঁকে। আর, একবার নির্দেশে ভুল হয়ে গেলে শোধরাতে যে অনেক দিন লেগে যায়, সে কথা তো জীবনানন্দ অনেক কাল আগেই বলে গেছেন।

বিজ্ঞান আন্দোলনের অক্লান্ত কর্মী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের কৃষকবধূ কিংবা ট্রেনের হকার যখন আমাদের লেখা থেকে বাঁচার রসদ পাবেন, প্রশ্নের উত্তর পাবেন, কিংবা সঠিক প্রশ্নটা তোলবার মতো উদ্দীপনা পাবেন, তখন জানব বিজ্ঞান আন্দোলন সার্থক। সে কত শতাব্দীর মনীষীর কাজ, জানি না। কিন্তু মাঝখানে আমাদের মতো ছোটোখাটো মানুষের কি কিছুই করার নেই?

দুটো জগৎ আছে—একদিকে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সৌধের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জগৎ, তার জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জগৎ। বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা লেখালিখি করেন, তাঁদের মধ্যে ক'জন অশোকের মতন দুটো স্তরেই সমান দাপটে ঘোরাফেরা করতে পারেন? আমাদের মতো লোক, যাদের সাংস্কৃতিক সংবেদন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেতু গড়ার বদলে দুয়ের মধ্যে একটা দেওয়াল তুলে দিয়েছে, তারা কোথায় যাবে? আমরা কি ব্রাত্য হয়েই থাকব?

কদিন আগে টিভির একটা অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে এই প্রশ্নটার একটা উত্তর যেন পেয়ে গেলাম। অন্যমনস্কভাবে রিমোট টিপতে টিপতে হঠাৎ শুনি, বেশ পরিশীলিত উচ্চারণে কেউ একজন আবৃত্তি করছেন—তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে। মন দিয়ে আবৃত্তিটা শুনলাম। বেশ লাগল। আবৃত্তিকারের নাম রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আবৃত্তি শেষে রঞ্জনবাবু ক্যামেরার দিকে চেয়ে বললেন, 'এ তো একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের কথা। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিই হয়েছে মানুষের জন্য। এটা আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।' বলে হঠাৎ ক্যামেরা থেকে বাঁদিকে ফিরে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, তাই তো?' ক্যামেরা ঘুরে সায়েবি পোশাক-পরা এক অত্যন্ত সুবেশ, সুঠাম প্রৌঢ়কে ফ্রেমে ধরল। তিনি অত্যন্ত প্রত্যয়ভরে বললেন, 'নিশ্চয়ই।' নীচে ক্যাপশন ফুটে উঠল: ডঃ মণি ভৌমিক। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে ওস্তাদ আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই কথাটা কি সত্যি? আধুনিক

পদার্থবিজ্ঞান কি এই কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিই হয়েছে মানুষের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য? সে বলল, কল্পবিজ্ঞানের আর অল্পবিজ্ঞানের কিছু কিছু লোক এরকম কথা বলার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সিরিয়াস বিজ্ঞানী এসব নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁরা কেবল অঙ্ক কষেন। সে অঙ্ক নিয়ে আর যাই হোক, গপ্পো ফাঁদা যায় না। তখন আমি তাকে উক্ত টিভি অনুষ্ঠানের এবং ডঃ ভৌমিকের প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণার কথাটা বললাম। সে হিজবিজবিজের মতো ফ্যাক ফ্যাক করে খানিক হাসল। তারপর বলল, 'তোমার কি আজকাল হাতে নষ্ট করার মতো সময় খুব বেড়ে গেছে?'

আমি তাকে বোঝাতে পারলাম না যে, টিভির ঐ অনুষ্ঠানকে সে পাগলামি-টাগলামি যাই বলুক, হাজার হাজার (নাকি লক্ষ লক্ষ?) লোক কিন্তু ঐ অনুষ্ঠান দেখে—বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান ভেবেই দেখে। রঞ্জনবাবু আর ডঃ ভৌমিক, দুজনেরই 'টিআরপি' রেটিং বেশ উঁচু, মণিবাবুর লেখা বই বেস্ট সেলার হয়েছে। এও তো 'বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ'! এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তাঁরা যথেষ্ট সফল। তাই প্রশ্ন: এই **জনপ্রিয়করণ কার স্বার্থে**? এবং এই জনপ্রিয়করণের মধ্যে দিয়ে কোন্ বার্তা পৌঁছে গেল জনগণের কাছে? এমন নয় যে, টিভিতে শয়ে শয়ে বিজ্ঞানের প্রোগ্রাম হচ্ছে, তার মধ্যে একটা-আধটা পাগলামির অনুষ্ঠান থাকলে কী-ই বা ক্ষতি? ঘটনাটা তো ঠিক উলটো। বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান রেডিয়োতে মোটামুটি নিয়মিত হলেও, টিভির টিআরপি-শাসিত জগতে তার প্রবেশ সাধারণত নিষেধ। কালেভদ্রে কখনো সখনো একটা-আধটা 'বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান' যখন হয়, তখন তার নমুনা ঐ। সাধারণ মানুষ কিন্তু সেই 'জনপ্রিয়' বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান দেখেই 'সবই ব্যাদে আছে' গোছের একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। অথচ আমার বিজ্ঞানী বন্ধুর তাতে কিছু আসে যায় না। তার এত সময় নেই যে এইসব 'পাগলামি'র প্রত্যুত্তর দেবে।

তাহলে সে-উত্তরটা কে দেবে? পাগলামির উত্তর তো পাগলামি দিয়ে দেওয়া যায় না, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও বলেও দেওয়া যায় না। তার ওপর এটা সাধারণ পাগলামি নয়, সেয়ানা পাগলামি: এর পিছনে চকচক করছে মুনাফাখোরদের লোভী চোখ। এদের সঙ্গে লড়তে হলে লেখাপড়া করে, বিজ্ঞান জেনেবুঝেই রণাঙ্গনে নামতে হবে। সেই কাজটা কি বিজ্ঞানকর্মীদের নয়? কেন তাঁরা বিজ্ঞানের নামে এই ধরনের অবিজ্ঞান প্রচারের মুখের মতো জবাব দেবার জন্য নিজেদের তৈরি করবেন না? হোমো সেপিয়েন্স নামক প্রাণীটির উদ্ভব একদিন হবে, এই কথা মাথায় রেখেই কেউ একজন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছিলেন কিনা, সেই গূঢ় প্রশ্নের সঙ্গে, চন্নামেত্তর খেয়ে বেকার শ্রমিকের ছোটো মেয়েটির মৃত্যুর, কিংবা জিনান্তরিত ফসলের বীজ পুতে তারপর কীটনাশক খেয়ে কৃষকের আত্মহত্যার অবশ্য কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার আপনার মতো লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্তের উদ্দাম জ্যোতিষ-মত্ততার কিংবা ইংরেজি-জানা বাবাজি-মাতাজি-ভক্তির অথবা আ-মস্তিষ্ক বিজ্ঞাপন-নিমগ্নতার বিলক্ষণ সম্পর্ক আছে। কোয়ান্টাম ছাপ্পা দিয়ে জ্যোতিষিক ধাপ্পাকে বৈজ্ঞানিক মোড়কে বিতরণ করার অনেক ঘটনাই সবার জানা আছে। প্রোটিন আর কার্বোহাইড্রেটের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে টলার, শার্পার এবং স্ট্রংগার হওয়ার অনেক রূপকথাও চালু আছে। শোষণের এটাও একটা রূপ। আধা-বিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান এই শোষণের এক বিরাট হাতিয়ার। মধ্যবিত্ত—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত—এই শোষণের শিকার।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে যেমন, তেমনি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করাটাও অত্যন্ত জরুরি। তবে তার প্রক্রিয়া-পদ্ধতি, বিশেষ করে তার ভাষা, হবে আলাদা।

আরো একটা কথা আছে। উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু বিজ্ঞান না-জানা মানুষের কাছেও বিজ্ঞানকর্মীদের পৌঁছতে হবে। সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে সুপণ্ডিত, কিন্তু ভুল বৈজ্ঞানিক ধারণার শিকার, এমন মানুষের সংখ্যা আমাদের এই খণ্ডিত সমাজে নেহাৎ কম নয়। এঁদের কাছে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করতে হলে সম্পূর্ণ অন্য একটা পদ্ধতি নিতে হবে। এঁরা বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষ, তাই এঁদের প্রশ্নও অনেক। সেইসব 'অনেকান্ত' প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো, এমনকি তা নিয়ে আলোচনা করবার মতো তাত্ত্বিক প্রস্তুতি অনেক সময়েই বিজ্ঞানকর্মীদের থাকে না। সেই পটুত্ব তাঁদের অর্জন করতে হবে।

একটা সময় ছিল যখন বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় পৌঁছে দেওয়াটাই যথেষ্ট বলে ভাবা হত। এখন কিন্তু পরিস্থিতি বদলে গেছে। 'বিগ সায়েন্সে'র চর্চা এখন খোলাখুলিভাবে বৃহৎ পুঁজি-নির্ভর। 'ফান্ড' না পেলে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অচল। আর এই বাজারি দুনিয়ায় ফান্ড যারা দেবে, তারা কড়ায় ক্রান্তিতে মুনাফা গুনে নেবে, এ তো স্বাভাবিক। বিজ্ঞান তাদের কাছে মুনাফা অর্জনের একটি কল মাত্র। তার মধ্যে দিয়েই মানুষের প্রয়োজনসাধক অনেক ভালো ভালো গবেষণা হয় ঠিকই, কিন্তু চটজলদি মুনাফা অর্জনে সফল না হলে সেসব গবেষণাকে শেষ পর্যন্ত মদত দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানের এই মুনাফা-সেবক চরিত্রটা দেখে অনেকে বিজ্ঞানের মানবিক চরিত্রের প্রতি ভরসা খইয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুনাফামুখী আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশ-বিধ্বংসী ভূমিকার প্রতি ঘৃণা। সব মিলিয়ে অবৈজ্ঞানিক, এমনকি আধা-ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রতি একটা আগ্রহ ক্রমে বেড়ে উঠছে। বিজ্ঞান-আন্দোলনকারীরা নিজেরাই কখনো কখনো সেই ধারায় যুক্ত হয়ে পড়ছেন। এই ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ জন্য তাঁদের বিজ্ঞানের ইতিহাস আর দর্শন সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত হতে হবে। বিজ্ঞানের মূল বৈপ্লবিক চরিত্রের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতেই হবে। নইলে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে চলে যাবে

সমাজের কর্তারা। যেখানে বিজ্ঞান কপচালে ক্ষমতা আর মুনাফা অর্জন করা যাবে, সেখানে তাঁরা বিজ্ঞান কপচাবেন; যেখানে অবিজ্ঞান/অপবিজ্ঞান কপচালে ক্ষমতা আর মুনাফার কাঠামো শক্তপোক্ত হবে, সেখানে অবিজ্ঞান/অপবিজ্ঞান কপচাবেন। এই পরিস্থিতিটা বিজ্ঞানকর্মীদের ভালো করে বুঝতে হবে। আগেকার মতো, নিছক বিজ্ঞানের তথ্য আর তত্ত্ব সহজ ভাষায় পৌঁছে দেওয়াটাই এখন আর যথেষ্ট নয়।

সংক্ষেপে, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের তিনটে ধাপ: **১। সমাজের মূল উৎপাদনশীল শ্রমজীবী অংশকে বিজ্ঞানের ক্রিয়াপদ্ধতি, বুনিয়াদি তথ্য ও নিয়মগুলি সম্বন্ধে অবহিত করা। ২। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞানের প্রভেদটাকে স্পষ্ট করা। অবিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞান কীভাবে তাঁদের কিছু বুজরুক আর মুনাফাখোরের হাতের পুতুল করে তুলছে তা বোঝানো। ৩। উচ্চশিক্ষিত কিন্তু বিজ্ঞানে অনবহিত 'এলিট' সম্প্রদায়ের কাছে বিজ্ঞানের ইতিহাস, বিজ্ঞানের দর্শন ও বিজ্ঞানের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা।** বলা বাহুল্য, এই তিন ধরনের কাজে পটুত্ব প্রয়োজন। সবার সব পটুত্ব থাকে না। কৃষককে জিনান্তরিত ফসলের বীজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার প্রক্রিয়া বা ভাষা যিনি আয়ত্ত করেছেন, তিনি হয়তো জ্যোতিষ-ব্যবসায়ের সার্বিক বুজরুকি উন্মোচনে তত পটু নন। আবার সে-কাজে যিনি পটু, তিনি হয়তো মহেশ যোগী কিংবা বৈদিক বিজ্ঞানের নাম করে কীভাবে হিন্দুত্ববাদ শিক্ষিত মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে, সেই প্রক্রিয়াটা সম্বন্ধে অত অবহিত নন। তার জন্য দরকার অন্য ধরনের পটুতা। আমার মতে, এই তিনটি স্তরে, তিন ধরনের পটুতা নিয়ে তিন ধরনের মানুষ বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার সার্বিক লক্ষ্য নিয়ে অগোতে পারেন। ইংরিজিতে যাকে বলে 'ডিফারেন্‌শিয়াল' পদ্ধতি। এই স্তরগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ সমন্বয় থাকলে খুবই ভালো; কিন্তু না থাকলেও খুব ক্ষতি নেই। মোটের ওপর স্বচ্ছ একটা ধারণা থাকাই যথেষ্ট। সে-ধারণার চাবি—শব্দটি হল: **কার স্বার্থে**?

[২৩/৯/২০১১ 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠান ভাষণের সংক্ষিপ্তরূপ]

আধ্যাত্মিকতা—আলোকিত হওয়া না ধাপ্পাবাজি

জাভেদ আখতার

[ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকা প্রতি বছর কয়েক দিনব্যাপী এক আলোচনা সভা বসায়। ২০০৫-এ এরকম সভার দ্বিতীয় দিনের, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, বিষয় ছিল—আধ্যাত্মিকতা—আলোকিত হওয়া না ধাপ্পাবাজি (Spirituality-Halo or Hoax)। প্রথম বক্তা ছিলেন খ্যাতনামা হিন্দু গুরু শ্রীশ্রী রবিশংকর। পরের বক্তা লেখক গীতিকার জাভেদ আখতার। জাভেদের বক্তৃতাটি এখনও প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় অনুবাদ করা হল।]

আমি নিশ্চিত যে এই মহতী সভায় সমবেত পুরুষ ও মহিলারা এই মুহূর্তে আমার বর্তমান অবস্থাকে করুণার চক্ষেই দেখছেন। আমি জানি যে শ্রী শ্রী রবিশংকরের মতন আকর্ষণীয় ও দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বের বক্তব্যের পর বলতে আসা যেন তেণ্ডুলকর আরেকটি দারুণ শতরান করে প্যাভেলিয়নে ফিরে যাবার পর ব্যাট করতে নামা। তবু আমার কোনো দুর্বল মুহূর্তে আমি এই আমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলাম। প্রথমেই দু'একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। আমার নাম জাভেদ আখতার—তা থেকে কোন কিছু বুঝে নেবার চেষ্টা করবেন না। আমি এ কথাটি টিভি-তে ও প্রকাশ্যে অনেকেবারই জানিয়েছি যে, আমি একজন নাস্তিক এবং কোনো ধরনের আধ্যাত্মিকতায় আমার বিশ্বাস নেই।

আরেকটি কথা, আমার পাশে উপবিষ্ট এই ভদ্রলোককে সমালোচনা, বিশ্লেষণ বা আক্রমণ করতে আমি এখানে আসি নি। আমাদের মধ্যে মধুর ভদ্র সম্পর্ক রয়েছে। সবসময়েই আমার ওঁকে একজন অত্যন্ত মার্জিত মানুষ মনে হয়েছে।

আমি একটি ভাবাদর্শ, একটি মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি। কোনও ব্যক্তির বিষয় নয়। আমার স্বীকার করা উচিত যে যখন রাজীব (মেরহোত্রা) এই অধিবেশন শুরু করলেন তখন একবার মনে হয়েছিল যে, আমার আসা ঠিক হয় নি। কারণ আমরা যদি এখন কৃষ্ণ, গৌতম, কবীর বা বিবেকানন্দ নিয়ে আলোচনা করতাম তাহলে আমার বলার কিছু ছিল না। যে উজ্জ্বল অতীত নিয়ে সব ভারতীয় যথার্থ ভাবেই গৌরব বোধ করে আমি তা আলোচনার জন্য আসি নি। আমি এসেছি বর্তমানের একটি সন্দেহজনক বিষয়ে কথা বলতে।

ইন্ডিয়া টুডে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে এবং আমি এসেছি আজকে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বলতে। আধ্যাত্মিকতা শব্দটি নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না, এক নামের দু'জন মানুষ পাওয়াই যায় যারা একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। রামচরিত মানস লিখেছিলেন তুলসীদাস আর ছবি বানিয়েছেন রামানন্দ সাগর, কিন্তু তা বলে দু'জনকে এক করে ফেললে চলবে না। আমার মনে পড়ে যে রামায়ণ লিখে তুলসীদাসকে সামাজিক বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়, কারণ এরকম পবিত্র কাহিনী তিনি কি করে অবধী-র মত একটি ভাষায় লিখলেন। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই যে সব ধর্মের, বর্ণের, সমাজের মৌলবাদীরা কি রকম একই

ধরনের হয়। ১৭৯৮ সালে দিল্লি শহরে শাহ আবদুল কাদির নামে এক ব্যক্তি প্রথম উর্দুতে কোরান অনুবাদ করেন। আর তার পরেই সমস্ত উলেমা-রা তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে থাকেন। কারণ কী করে তিনি এরকম পবিত্র গ্রন্থকে পৌত্তলিক ভাষায় অনুবাদ করতে পারলেন। যখন তুলসীদাস রামায়ণ অনুবাদ করে সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি এই চৌপাই লিখলেন—

—ধুত কহো অবধূত কহো রাজপুত কহো কি জুলায়া কহো
—কহু কি বেটিসে বেটা না বিহাব, কহু কি জাত বিগার চাহু
—মাংগকে খাইবো, মজিদ মা রহিবো, লেবে কা এক না দেবেকো দোহু।

রামানন্দ সাগর ছবি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন। আমি তাঁকে ছোট করছি না কিন্তু তিনি তুলসীদাসের সমপর্যায়ের নন। আমি আপনাদের আরেকটি উদাহরণ বলি। মনে হয় এটি আরো সরাসরি ও উপযুক্ত হবে। গৌতম (বুদ্ধ) সত্যের সন্ধানে প্রাসাদ ছেড়ে নির্জনে গেলেন। কিন্তু **আজকাল দেখি আধুনিক গুরুরা নির্জন থেকে এসে প্রাসাদে ঠাঁই নিচ্ছেন। এরা উল্টোপথে হাঁটছেন। সুতরাং এদের কথা আলাদা। ভারতীয়দের কাছে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়দের নামের সুযোগ নিয়ে এদের বিবেচনা করলে চলবে না।**

যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হল তখন আমি ভাবলাম যে আমি একজন নাস্তিক এবং সব অবস্থাতেই যুক্তিবাদী থাকার চেষ্টা করি এবং সেজন্যই হয়ত আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল আধুনিক গুরুদের সঙ্গে আমার একটি জায়গায় খুব মিল রয়েছে। আমি চলচ্চিত্র জগতে কাজ করি। আমাদের অনেকগুলি সাদৃশ্য আছে। আমরা দুজনেই স্বপ্ন বেচি, আমরা দুজনেই কল্পনার জগৎ বানাই, আমরা দুজনেই আদর্শ পুরুষ তৈরি করি। কিন্তু একটা তফাৎ আছে। তিন ঘণ্টা পরে আমরা একটা প্ল্যাকার্ড দেখাই—সমাপ্ত। এবার বাস্তবে ফেরো। আধুনিক গুরুরা সেটা করেন না।

সুতরাং ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে আমি সেই আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বলতে এসেছি যার বিশ্বজুড়ে একটা বড় বাজার রয়েছে। অস্ত্র, মাদক ও আধ্যাত্মিকতা—আজকের পৃথিবীতে এই তিনটি বৃহৎ ব্যবসা। কিন্তু অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ে আপনাকে কিছু মাল দিতে হবে। বড় তফাৎটা এখানেই যে আধ্যাত্মিকতার ব্যবসায় কিছুই দিতে হবে না।

আধ্যাত্মিকতার এই সুপার মার্কেটে আপনি চটজলদি নির্বাণ, ই-মেলে মোক্ষ, আত্মচেতনার ক্র্যাশ কোর্স বা চারটি সহজ সেশনে মহাজাগতিক চেতনা পেয়ে যাবেন। এই সুপার মার্কেটের শাখা সারা দুনিয়া জুড়ে রয়েছে যেখানে অশান্তচিত্ত উচ্চবিত্তেরা আধ্যাত্মিক ফাস্ট খুড কিনে নিচ্ছে। আমি এই আধ্যাত্মিকতার কথা বলছি।

প্লেটো অনেক বিচক্ষণ কথা বলেছেন, তার একটি—কোনো আলোচনা শুরুর আগে শব্দের অর্থ স্পষ্ট করে নাও। দেখা যাক আধ্যাত্মিকতা কথাটির অর্থ কী হতে পারে। এটার অর্থ কি ধর্ম, জাত, বিশ্বাস, বা জাতির ঊর্ধে উঠে সমগ্র মানবজাতির জন্য ভালবাসা? যদি তাই হয় তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই, একে আমি বলব মানবতা। এটার অর্থ কি গুল্ম, বৃক্ষ, পর্বত, সাগর, নদী, প্রাণীদের জন্য প্রেম? তাহলেও আমার কোনো সমস্যা নেই, শুধু একে আমি বলব পরিবেশ সচেতনতা। যদি আধ্যাত্মিকতার অর্থ হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বিবাহ, পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব, চারুকলা, আইন ব্যবস্থা, মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, তাহলেও আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি একে বলি সামাজিক দায়বদ্ধতা। আধ্যাত্মিকতার অর্থ কি নিজস্ব জগতে প্রবেশ করে আত্মানুসন্ধান, জীবনের অর্থ খোঁজা? এতে আপত্তি করার কী আছে! একে আমি বলি আত্ম-বিশ্লেষণ, আত্মসমীক্ষা। আধ্যাত্মিকতার মানে কি যোগাভ্যাস? পতঞ্জলিকে ধন্যবাদ, তিনি অনেক আগেই যোগ, আসন, প্রাণায়াম সম্পর্কে আমাদের বিশদে জানিয়ে গেছেন। আমরা বিভিন্ন নামে তা করতে পারি। যদি কেউ প্রাণায়াম করেন তা ভালোই, তবে আমি এটাকে বলব শরীরচর্চা।

তাহলে একি শুধু শব্দার্থতত্ত্ব চর্চা? যদি আধ্যাত্মিকতা মানে এই তবে তা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই। আমি যেসব শব্দ ব্যবহার করেছি সেগুলি অত্যন্ত সম্মানজনক শব্দ এবং গ্রহণীয়ও বটে। এগুলির মধ্যে কোনো বিমূর্ত বা দুর্বোধ্য কিছু নেই। ফলে আধ্যাত্মিকতা শব্দটির আর কী দরকার? আধ্যাত্মিকতা বলতে আর কী বোঝায় যা এই শব্দগুলির মধ্যে নেই? সত্যি কি সেরকম কিছু আছে? তাহলে তা কী?

অবশ্যই কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে আধ্যাত্মিকতা শব্দটি নিয়ে কি আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে? হ্যাঁ, আমি এই শব্দটিকে পরিবর্তন করতে, বাদ দিতে, লুপ্ত করতে চাই। কিন্তু কেন? শব্দটি সম্পর্কে আমার আপত্তির কারণ এবার খোলসা করি। আধ্যাত্মিকতা বলতে আমি যে সব শব্দ বলেছি তা হলে আর আলোচনার দরকার নেই। কিন্তু আসলে এর মধ্যে অন্য একটি বিষয় আছে যার জন্য আমি চিন্তিত। অভিধানে ইংরাজিতে স্পিরিচুয়ালিটি শব্দটি 'স্পিরিট' কথাটির সঙ্গে যুক্ত (বাংলায় আধ্যাত্মিকতার অর্থ আত্মাকে অধিকার করিয়া জাত—বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: অনুবাদক)। যখন মানুষ জানত না পৃথিবীটা সমতল না গোলক, তখন সে নির্ণয় করে ফেলল যে মানুষ দেহ আর আত্মার সমন্বয়ে তৈরি। দেহ অস্থায়ী, এর মৃত্যু হয়। কিন্তু আত্মা তা নয়, একে কি জীব-বিয়োজনরহিত (non-biodrgradable) বলা যায়? আপনার দেহে যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, মস্তিষ্ক রয়েছে। কিন্তু মস্তিষ্ক দেহের অংশ, যেখানে রয়েছে আমাদের মন—এবং মন কোনো উৎকৃষ্ট বস্তু নয় কারণ দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কেরও মৃত্যু হবে। কিন্তু এতে চিন্তার কোন কারণ নেই, এতে আমার মৃত্যু হচ্ছে না, আমার আত্মার কোনো মৃত্যু নেই, আত্মার পরম চেতনা চিরন্তন। আসলে

সমস্যা হচ্ছে তোমার মন নিয়ে। তুমি তোমার মনের কথা না শুনে তোমার আত্মার কথা শোনো, যে আত্মা জানে মহাজাগতিক সত্য। বাঃ। আমার বাকচাতুর্য শুনতে ভাল লাগে, আমি পুনেতে এক আশ্রমে যেতাম। সেখানে সভা কক্ষের বাইরের দরজায় লেখা আছে—তোমার জুতো ও মন এখানে রেখে যাও। অনেক গুরু অবশ্য জুতো নিয়ে ঢুকলে কিছু মনে করেন না। কিন্তু মন নিয়ে? না, সেটা চলবে না।

এখন তুমি যদি তোমার মনকে ত্যাগ করো তবে তুমি কী করবে? তোমার তখন চেতনার পরবর্তী স্তরে যেতে একজন গুরুর প্রয়োজন হবে। এই গুরু সেই আত্মার মধ্যে লুকিয়ে আছেন। তিনি পরম চেতনায় পৌঁছে গেছেন, তিনিই পরম সত্য জানেন। তিনি কি তা তোমাকে জানাতে পারেন? না, তিনি তা পারেন না। তুমি কি নিজেই তা জানতে পার? না তার জন্য গুরুর প্রয়োজন। তোমার তাকে দরকার কিন্তু তিনি গ্যারান্টি দিতে পারছেন না যে তুমি সেই পরম সত্যকে জানতে পারবে। আর সেই পরম সত্য কী? মহাজাগতিক সত্যই বা কী? তা কি মহাকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত? এসব কথা আমি কিছুই বুঝতে পারি না। যে মুহূর্তে আমরা সৌর জগতের বাইরে পা রাখব, প্রথম নক্ষত্র পাব আলফা সেঞ্চুরিকে। এটি মাত্র চার আলোকবর্ষ দূরে। আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? আমার কী করণীয়? সুতরাং মহারাজের কাপড় কেবল জ্ঞানীরাই দেখতে পান। এবং মহারাজের দিনে দিনে আরো শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। দিনে দিনে আরো বেশি সংখ্যক জ্ঞানীরা রাজার কাপড়ের প্রশংসা করছেন।

আমি ভাবতাম, আসলে আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যক্তিদের দ্বিতীয় রক্ষাকবচ। যখন তাঁরা প্রচলিত ধর্ম নিয়ে বিব্রত হন, বিষয়টি একেবারে বাজারি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হতে থাকে, তখন তাঁরা এইসব মহাজাগতিক বা পরম চেতনার ধূম্রজালে নিজেদের গোপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা পুরোটা সত্যি নয়। কারণ প্রচলিত ধর্মের খদ্দের আর আধ্যাত্মিকতা খদ্দেররা ভিন্ন। একটি পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে তাতে ভারতের ভিতরে আর বাইরে চরম ধর্মীয় অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করুন। দেখবেন যেখানে যত বেশি ধর্ম সেখানে তত বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন। সেখানে নিপীড়ন। আমাদের মার্কসবাদী বন্ধুরা বলতেন ধর্ম হচ্ছে গরিব জনতার আফিঙ, নিপীড়তদের দীর্ঘশ্বাস। আমি এখন সে আলোচনায় ঢুকতে চাই না। তবে এটা নিশ্চিত, এখন আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ধনীদের ঘুমের ওষুধ।

এই খদ্দেররা অভিজাত উচ্চবিত্ত। সুতরাং তাদের গুরু অনেক ক্ষমতা, অর্থ, মর্যাদা, নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণার অধিকারী হন। কিন্তু শিষ্যরা কী পান? ভাল করে নজর করলে দেখা যাবে যে এই শিষ্যদের মধ্যে অনেক ধরনের স্তর রয়েছে। এরা কেবল একটি গোষ্ঠী নন। এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিষ্য, বিভিন্ন ধরনের ভক্ত রয়েছে। কেউ দারুণ সফল ব্যক্তি, প্রভূত অর্থ উপার্জন করছে, সম্পত্তি বানাচ্ছে। এখন যেহেতু তার সবই আছে, এখন সে এসব থেকে মুক্তি চায়। সুতরাং গুরু তাকে বললেন—তুমি যা করছ সবই নিষ্কাম কর্ম, তুমি নিমিত্ত মাত্র, এই সবই 'মায়া'। রোজ যে অর্থ তুমি উপার্জন করছ, যে সম্পত্তি অর্জন করছ তুমি তার সাথে কোন আবেগে জড়িত নও। তুমি শুধু একটি ভূমিকা পালন করছ মাত্র। তুমি আমার কাছে এসেছ কারণ তুমি পরম সত্যকে জানতে চাও। তোমার হাত নোংরা হতে পারে কিন্তু তোমার আত্মা, তোমার চিত্ত পবিত্র। ফলত এই মানুষটি নিজেকে এবার দারুণ ভাল ভাবতে শুরু করে। সে সাতদিন দুনিয়াকে শোষণ করে তার গুরুর পদতলে বসে ভাবে—আমি একজন সংবেদনশীল মানুষ।

আরেক ধরনের শিষ্য রয়েছে। এও সেই উচ্চবিত্ত শ্রেণীর একজন কিন্তু ততটা সফল নয়। আপনারা জানেন যে সফলতা আর ব্যর্থতা আপেক্ষিক ধারণা হতে পারে। ফুটপাতে একশ টাকা জুয়ায় জিতে একজন রিক্সাচালক নিজেকে সফল ভাবতে পারেন আবার কর্পোরেট জগতের একজন ৩০ লক্ষ টাকা জিতলেও তার কোটিপতি ভাইয়ের কথা ভেবে নিজেকে ব্যর্থ ভাবেন। এখন এই অসফল ধনী কী করেন? তার একজন গুরু দরকার যে বলবেন, কে বলেছে তুমি ব্যর্থ? তোমার এক অন্য জগত রয়েছে, অন্য দিশা রয়েছে, অন্য চেতনা রয়েছে যা তোমার ভাইয়ের নেই। সে তখন ভাবে সেও সফল। কিন্তু আসলে দুনিয়া বড় নির্মম। দুনিয়া তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় তুমি আসলে দশে তিন পেয়েছ আর ও পেয়েছে দশে সাত। তোমার সঙ্গে তারা এভাবেই ব্যবহার করবে। ফলে সেজন্য তার চাই সমবেদনা, তার দরকার অন্য এক অভিনয়।

এবার আমি আরেক বিশেষ খদ্দেরদের কথা বলব। আমি কোন রকম অবজ্ঞা। হামবড়াই, তিক্ততার মনোভাব নিয়ে বলছি না, আমি পূর্ণ সমবেদনার মনোভাব নিয়ে এই আধুনিক যুগের গুরুদের একটি প্রধান খদ্দেরদের কথা বলব। এরা হচ্ছে বড়লোকের অসুখী বউরা।

এ হচ্ছে এমন একজন মানুষ যে তার ব্যক্তিত্ব, আকাঙ্খা, স্বপ্ন—সব বিবাহের বেদিতে সমর্পণ করে পেয়েছে এক স্বামী যার তার সম্পর্কে কোন উৎসাহ নেই। যে বড়জোর তাকে কয়েকটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সে তার নিজের কাজে বা অন্য মহিলার জন্য সদাই ব্যস্ত। এই নারীর দরকার একজন সহায়। সে জানে তার ব্যর্থ অস্তিত্বের কথা, সে জানে তার কারো কাছে কিছু পাবার নেই। তার রয়েছে একটি স্বাচ্ছন্দ্যের কিন্তু শূণ্য, দিশাহীন জীবন। কথাটা দুঃখজনক কিন্তু সত্য।

আরেক ধরনের ভক্তেরা আছেন যারা হঠাৎ কোন কারণে শোকগ্রস্ত হয়েছেন। কেউ সন্তান হারিয়েছেন, কেউ স্বামী বা স্ত্রী হারিয়েছেন, কারো সম্পত্তি বা ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে। হঠাৎ এইসব ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা প্রশ্ন করেন কেন আমারই ক্ষতি হল? কিন্তু কাকে করবেন প্রশ্ন, কে দেবে উত্তর? তারা গুরুর কাছে যান। গুরু

তাদের বলেন এ সবই কর্মফল। কিন্তু আমি তোমাদের এক অন্য জগতে পৌঁছে দিতে পারি যেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই, সেখানে কেবলই আনন্দ আর অমরত্ব। তিনি এই দুঃখী মানুষদের বোঝান যে তিনি তাদের সেই আনন্দের স্বর্গে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আমি দুঃখিত এটা বলতেই হচ্ছে যে সেরকম কোন স্বর্গ কোথাও নেই। জীবনে কিছু দুঃখ, আঘাত, পরাজয় থাকবেই। কিন্তু দুঃখী মানুষেরা ঐসব কথাতেই কিছু স্বস্তি পান।

কেউ বলতেই পারেন যে ওরা যদি কিছুটা ভাল বোধ করেন কিছুটা মনে শান্তি পান তাহলে আপনার অসুবিধা কোথায়? এতে আমাকে একটা পুরানো গল্প মনে করিয়ে দেয়। এ এক প্রাচীন ভারতীয় ঋষির বলা গল্প। একটি ক্ষুধার্ত কুকুর কিছু না পেয়ে একটি শুকনো হাড়কেই চিবোচ্ছিল। এতে সে তার জিভ কামড়ে ফেলে। সেখান থেকে রক্ত বেরুতে থাকে। কুকুর হাড় থেকেই রক্ত বেরুচ্ছে ভেবে চিবিয়ে চলে।

আমি এতে দুঃখ পাই। এই প্রাপ্তবয়স্কদের এরকম আচরণ আমার কাম্য নয়। কারণ আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মদ বা মাদকও এ ধরনের শান্তি, প্রসন্নতা দেয়। কিন্তু এই শান্তি বা প্রসন্নতা কি কাম্য? আদৌ না। যে কোনো মানসিক শান্তি যদি যুক্তির সাথে সম্পর্কহীন হয় তবে তা শুধু আত্মপ্রতারণা মাত্র। যে প্রশান্তি আপনাকে বাস্তবতা থেকে দূরে নিয়ে যায় তা শুধু বিভ্রম, মরীচিকা। আমি জানি যে তা এক ধরনের নিশ্চিন্ততা দেয় কিন্তু তা হল তিন চাকার সাইকেল চালানোর নিরাপত্তা। তিন চাকার সাইকেল থেকে আপনি পড়ে যাবেন না কিন্তু প্রাপ্তবয়স্করা কেউ তা চালায় না। তারা দু-চাকার বাইসাইকেল চালায়, তারা তা থেকে পড়ে যেতেও পারে। কিন্তু তা জীবনেরই অঙ্গ।

এছাড়াও আরেকটি ধরন আছে। যেমন গলফ্ ক্লাবের সদস্যরা সবাই যে গলফ্ ভালবাসেন তা নয়। একই ভাবে যাদের আশ্রমে দেখা যায় তারা সবাই আধ্যাত্মিক মানুষ নন। আমার পরিচিত একজন চিত্র প্রযোজক এক গুরুর খুব ভক্ত, দিল্লির কয়েক কিলোমিটার বাইরেই তার আশ্রম। তিনি আমায় বললেন যে আমি যেন তার গুরুর আশ্রমে যাই কারণ সেখানে গেলে দিল্লির সব গণ্যমান্যদের দেখা পাওয়া যাবে। আরো বললেন যে তার গুরু চন্দ্রস্বামীর মতন হতে যাচ্ছেন। এই আশ্রম এখন যোগাযোগ তৈরির কেন্দ্র।

যারা আধ্যাত্মিক বা ধার্মিক তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কারণ এতদসত্ত্বেও তাঁরা ভালো মানুষ। কেন তা বলছি। আমি মনে করি যে কোন আবেগ বা অনুভূতির একটি সীমা আছে। (আমার আর বেশি সময় নেই, আমি আরো পাঁচ-ছ মিনিট পেতে পারি?/রাজীব মেরহোত্রা—হ্যাঁ, পারেন)। আপনি একটি দূরত্ব পর্যন্ত দেখতে পাদ্দেরন, তার পর আর নয়। একটি দূরত্ব পর্যন্ত আপনি শুনতে পারেন, তারপর আর নয়। আপনি একটি সময় পর্যন্ত শোকাহত হয়ে থাকতে পারেন তারপর আপনি শোককে কাটিয়ে ওঠেন, একটা সময় পর্যন্ত আনন্দে উদ্বেল হতে পারেন তারপর সেই অবস্থা আর থাকে না। এভাবেই আপনার মহত্ব প্রদর্শনেরও একটি সীমা রয়েছে, তারপর আর আপনি এগোতে পারেন না। ধরা যাক একজন সাধারণ মানুষের এই মহত্বের পরিমাণ ১০ একক। যে দিনে ৫ বার নামাজ পড়তে যায় সে তার মহত্বের ভাগের ৫ একক সেখানেই খরচ করে ফেলে, যে মন্দিরে যাচ্ছে বা গুরুর পদসেবায় ব্যস্ত সেও তার মহত্বের ভাগের অনেকটাই এসবে খরচ করে ফেলছে। এবং এই খরচটা পুরোটাই হচ্ছে অকাজের। আমি কোন প্রার্থনায় যাই না। আমি যদি কোন গুরুর কাছে বা মন্দির বা মসজিদ না যাই তবে আমার মহত্বের ভাগ দিয়ে কী করব? আমি কাউকে সাহায্য করতে, খাওয়াতে বা আশ্রয় দিতে পারি। যারা তাদের মহত্বের ভাগ পূজা, প্রার্থনা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুদের জন্য খরচ করেও অন্যদের জন্য কিছু রাখতে পারেন, তাদের তো ধন্যবাদ জানাতেই হবে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে আমি যখন ধর্মীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে এরকম ভাবি তখন আমি কৃষ্ণ বা কবীর বা গৌতমের প্রতি কেন শ্রদ্ধা দেখাব? আমি এর উত্তর দিচ্ছি। এঁরা মানব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এঁরা ইতিহাসের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল রয়েছে। এঁরা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, নিপীড়েতের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। রাবণ, কংস, ফারাও, পুরোহিততন্ত্র, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গান্ধি বা ফিরোজ, তুঘলকের সাম্প্রদায়িক রাজত্বের বিরুদ্ধে কবীর—এঁরা এদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

এবং আমাকে আশ্চর্য করে, আমার নিকৃষ্টতম আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করে যে আজকের মহাজাগতিক সত্য জানা জ্ঞানীরা কেউ ক্ষমতার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না। এরা কেউ শাসকশ্রেণী বা সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তোলে না। দানধ্যান করে কিন্তু তা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতের সম্মতি ও অনুমতি নিয়েই। আমি জানতে চাই কোন গুরু দলিতদের জন্য নিষিদ্ধ মন্দিরে তাদের নিয়ে গেছেন, আমি জানতে চাই কোন গুরু আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। আমি জানতে চাই কোন গুরু গুজরাতের ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে কথা বলেছেন, তাদের দেখতে শরণার্থী শিবিরে গেছেন। এরা সাধারণ মানুষ।

মাননীয় সভাপতি, ধনীদের শ্বাস-প্রশ্বাস শেখানো যথেষ্ট নয়। এটা ধনীদের প্রমোদ। এটা ভণ্ডদের একটা ছলনা। এটা ক্ষতিকারক প্রবঞ্চনা। এবং আপনি হয়তো জানেন যে অক্সফোর্ড অভিধানে ক্ষতিকারক প্রবঞ্চনার অর্থ হচ্ছে Hoax বা ধাপ্পাবাজি। ধন্যবাদ।

অনুবাদক মোহিত রায়

পুনর্মুদ্রণ: পর্বান্তর। বর্ষ: ৪ সংখ্যা: ৪, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১

জলবায়ু পরিবর্তন পুনর্বিবেচনা

প্রধান লেখক: ক্রেইগ ইডসো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), এস ফ্রেড সিঙ্গার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) দ্য ননগভর্নন্টোল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এন আই পি সি সি)-র দ্বারা প্রকাশিত।
অনুবাদক — অমিতাভ গুপ্ত

গত সংখ্যার পর

এক্সিকিউটিভ সামারি

ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর ওয়ার্কিং গ্রুপ ওয়ান (সায়েন্স)-এর চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটি (আই পি সিসি-এ আর ৪, ২০০৭) নিঃসন্দেহে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একটি অতি জরুরি নথি। বেশ কিছু গবেষকের সর্বক্ষণের কাজের ফসল এই রিপোর্টটি। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানের জগতে কী কাজ হচ্ছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বাঙ্গীণ নথি এই রিপোর্ট। এবং, আই পি সি সি-র আগের অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে যার অভাব প্রকট ছিল, চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের শেষে সেই অতি জরুরি ইনডেক্স আছে। আই পি সি সি-র অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের ইতিহাসে চতুর্থ রিপোর্টটি আরও একটি ক্ষেত্রে প্রথম— এই প্রথম বার রিপোর্টটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলিকেও রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট ফোর নিঃসন্দেহে সমীহ আদায় করার যোগ্য। কিন্তু, বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নে এই রিপোর্টটিকে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব কি? না। জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞান এবং সেই সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এই রিপোর্টটিকে ভরসা করা চলে না। কেন, তার স্পষ্ট কারণ রয়েছে। রিপোর্টটিতে বেশ কিছু ভুল রয়েছে, বিভ্রান্তিকর মন্তব্য রয়েছে; রিপোর্টটি রচনার সময় সহজলভ্য ছিল, কিন্তু রিপোর্টের রচয়িতাদের মনে আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকা সিদ্ধান্তের বিপ্রতীপ অবস্থান নেয়, এমন বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এই রিপোর্টে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হয়েছে; এবং, আই পি সি সি-র 'কাট অফ ডেট', মে ২০০৬-এর পর প্রকাশিত অনেক নিবন্ধে এই রিপোর্টের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

সামগ্রিক ভাবে, আই পি সি সি-র রিপোর্ট কিছু জরুরি বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের আলোচনা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই প্রশ্নগুলির বেশ কয়েকটি আই পি সি সি-র মূল অবস্থান 'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা যতখানি বেড়েছে, সেই বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই খুব *সম্ভবত* হয়েছে মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য' (নজরটান নিজস্ব)-এর পরিপন্থী। 'খুব সম্ভবত' মানে, আই পি সি সি-র মতে, কথাটি অন্তত ৯০ শতাংশ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায়। কিন্তু, কী ভাবে এই '৯০ শতাংশ' সংখ্যাটি নির্ধারিত হল, তার কোনও ব্যাখ্যা আই পি সি সি দেয়নি।

বিশ্ব-উষ্ণায়নের কতখানি প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে, আর কতখানি গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করার জন্য আই পি সি সি পরিবেশবিদ্যার সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতিগুলির সাহায্য নেয়নি। সেরা পর্যবেক্ষণগুলি থেকে যে ফুটপ্রিন্ট পাওয়া যায়, তার সঙ্গে সেরা গ্রিনহাউস গ্যাস মডেলের ফলাফলের তুলনা করলেই দেখা যায়, বিশ্ব-উষ্ণায়নের পিছনে মানুষের তৈরি করা গ্রিনহাউস গ্যাসের অবদান সামান্যই। এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পর্যবেক্ষণগুলি আই পি সি সি-র রিপোর্ট তৈরি করার সময়ও সহজলভ্য ছিল, কিন্তু রিপোর্ট রচয়িতারা এই তথ্যকে গুরুত্ব দেননি।

আই পি সি সি এখনও এই কথাটি মেনে নিতে নারাজ যে দশকব্যাপী এবং শতাব্দীব্যাপী সময়সীমা (ডেকেডাল অ্যান্ড সেঞ্চুরি-লঙ টাইম স্কেল)-এ বার বার এই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে অতীতে যে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে, তার জন্য প্রধানত দায়ী সূর্য এবং সংশ্লিষ্ট বায়ুমণ্ডলীর মেঘের প্রভাব। কাজেই, বিংশ শতাব্দীতে যে উষ্ণায়ন ঘটেছে, তারও প্রধান কারণ সূর্য হওয়ার সম্ভাবনা চড়া। মানুষের কাজকর্মের ফলে তৈরি হওয়া গ্রিনহাউস গ্যাসের অবদান থাকলেও তা নিতান্তই সামান্য। এ ছাড়াও, আই পি সি সি-র রিপোর্ট অন্যান্য কিছু বৈজ্ঞানিক প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়েছে, অথবা দায়সারা ভাবে আলোচনা করেছে। এই প্রশ্নগুলি বিশদ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আই পি সি সি-র এই ভ্রান্তি এবং এড়িয়ে যাওয়াগুলি এন আই পি সি সি-র বর্তমান রিপোর্টে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই রিপোর্টের মোট নয়টি অধ্যায়। এখানে প্রথমে সেই অধ্যায়গুলির মূল বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হয়েছে, এবং এই এক্সিকিউটিভ সামারির অবশিষ্ট অংশে অধ্যাগুলির পরিচয় আরও বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হয়েছে।

আই পি সি সি-র কম্পিউটারভিত্তিক জলবায়ু মডেল (কম্পিউটার ক্লাইমেট মডেল)-এর মধ্যেমে ভবিষ্যতের জলবায়ু সম্বন্ধে পূর্বাভাস করার সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী, তা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস করার জন্য যে নির্দিষ্ট নিয়ম এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, আই পি সি সি তার অনেকগুলিকেই মানে নি। ফলে,

সংস্থাটির 'পূর্বভাস' নীতিনির্ধারকদের কাছে কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য। আজকের স্টেট অব দি আর্ট মডেলগুলি যতই উন্নত মানের হোক না কেন, তাতে এমন কিছু খামতি রয়ে গিয়েছে যে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে বিশ্বের গড় তাপমাত্রার কী পরিবর্তন হবে, এই হিসেবটি করার সময় চিহ্ন (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক, অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়বে না কমবে, তার সূচক) উল্টিয়ে যেতে পারে। আই পি সি সি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের পরিমাপ করার জন্য যে মডেল ব্যবহার করে, সেগুলি যদি নির্ভরযোগ্যই না হয়, তবে অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট চার পড়তে যতই দারুণ লাগুক না কেন, নীতিনির্ধরণের বিতর্কে তার কোনও দাম থাকতে পারে না। ভ্রান্ত মডেলের ওপর নির্ভর করে তো বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধ করার জন্য কী করা উচিত, তা ঠিক করা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, ফিডব্যাক ফ্যাকটর কী ভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের টেম্পারেচার সেনসিটিভিটিকে কমায়, অর্থাৎ ফিডব্যাক ফ্যাক্টর থাকার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব যতখানি বৃদ্ধি পায়, তার দরুণ তাপমাত্রা ততখানি বাড়ে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রাক-শিল্পায়ন যুগের কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব দ্বিগুণ হলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যত হবে বলে দেখা গিয়েছে, তা আই পি সি সি-র অনুমানের তুলনায় ঢের কম। পরিবেশ ব্যবস্থায় ফিডব্যাকের সংশোধিত মান ব্যবহৃত হলে পৃথিবীর ক্লাইমেট সেনসিটিভিটির যা মান পাওয়া যায়, তা আই পি সি সি-র ব্যবহৃত মানের তুলনায় অনেকটাই কম।

তৃতীয় অধ্যায়ে অতীতের তাপমাত্রা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। আই পি সি সি-র যে দুটি প্রধান দাবি, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয়েছে, তা অ-ভূতপূর্ব, বা এই পরিবর্তনের পিছনে মানুষের কাজকর্মের অবদান রয়েছে, সেই দুটি দাবির একটির সপক্ষেও কোনও তথ্যপ্রমাণ আমরা খুঁজে পাইনি। আমাদের গবেষণায় বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় দেখা গিয়েছে— আমরা মান ও অন্যান্যদের তথাকথিত 'হকি স্টিক' মডেলে পদ্ধতিগত ভ্রান্তির (মেথডলজিক্যাল এরর) সন্ধান পেয়েছি; আমরা প্রামাণ পেয়েছি যে গোটা বিশ্বেই একটি মধ্যযুগীয় উষ্ণ পর্যায় (মিডিয়াভাল ওয়ার্মপিরিয়ড) ছিল; অপেক্ষাকৃত আধুনিক পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার যে রেকর্ড রয়েছে, আমরা তাতে ভুল খুঁজে পেয়েছি; অতি নিখুঁত উপগ্রহ-চিত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে গত ২৯ বছরে বিশ্বে কোনও মোট উষ্ণায়ন (নেট ওয়ার্মিং) ঘটেনি; এবং, প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে আধুনিক যুগের উষ্ণায়নের বন্টনের মধ্যে মানুষের কাজকর্মের প্রভাবের কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট অর্থাৎ ছাপ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়ে হিমবাহের গলন, সমুদ্রের বরফের গলন, বৃষ্টিপাতের তারতম্য, এবং সমুদ্রতলের উচ্চতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় আমরা এমন কোনও পরিবর্তনের প্রমাণ পাইনি যাকে বিংশ শতাব্দীর মনুষ্যসৃষ্ট বিশ্ব-উষ্ণায়নের ফল হিসেবে দেখা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সেই গবেষকদের গবেষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ সূর্য, মানুষের কাজকর্মের ফলে তৈরি হওয়া গ্রিনহাউস গ্যাস নয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই গোত্রের বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সূর্য এবং পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তা আমরা এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। এবং, সৌরমণ্ডলের কোনও সামান্য পরিবর্তন কী ভাবে পৃথিবীর জলবায়ুর উপর বৃহৎ প্রভাব ফেলতে পারে, তার নির্দিষ্ট এবং নিখুঁত প্রক্রিয়াটি বের করার জন্য গবেষকরা কী পরিমাণ চেষ্টা করেছেন, তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি, সূর্য, মহাজাগতিক রশ্মি (কসমিক রে) এবং মেঘে প্রতিফলনের মধ্যে যে সম্পর্কটি আছে, এই বিজ্ঞানীরা কী ভাবে সেই সম্পর্কটি (সম্ভবত) প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বিশ্ব-উষ্ণায়ন সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় ভয়টিকে নিয়ে। বিশ্ব-উষ্ণায়নের ফলে আরও চরম জলবায়ুর সম্মুখীন হতে হবে, এই বিশ্বাসটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রায় সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি, এই দাবিটি ভ্রান্ত, এর মধ্যে সারবত্তা নেই। আই পি সি সি-র দাবি, বিশ্ব-উষ্ণায়নের ফলে খরা, বন্যা, সামুদ্রিক ঘূর্নিঝড়, ঝড়, তাপপ্রবাহ এবং দাবানলের সংখ্যা বাড়বে (বা ইতিমধ্যেই বেড়েছে)। আমরা দেখেছি, বিজ্ঞানী মহলে যে গবেষণাপত্রগুলি লেখা হচ্ছে (এবং, যেগুলিকে অন্য বিজ্ঞানীরা স্বীকৃতি দিচ্ছেন), সেখানে এই দাবির সপক্ষে প্রায় কোনও প্রমাণই নেই। বরং, এই দাবির সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ দাবির— উষ্ণায়ন ঘটলে পৃথিবীর আবহাওয়া এখনকার তুলনায় কম চরম হবে— প্রতি সমর্থনের নিদর্শন প্রচুর।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে এবং ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়লে এই গ্রহে প্রাণের ওপর তার কী প্রভাব পড়বে। বিশ্ব-উষ্ণায়ন নিয়ে যে তর্ক সর্বক্ষণ চলে, তাতে এই দিকটি প্রভূত পরিমাণে অবহেলিত থেকে গিয়েছে। তার কারণ সম্ভবত এই যে পৃথিবীতে প্রাণের ওপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পূর্ণ ইতিবাচক। কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তাতে গাছপালার বৃদ্ধির হার বাড়ে। তার ফলে সেগুলির মধ্যে খরা ও কীটের আক্রমণ থেকে বাঁচার শক্তিও বাড়ে। অতএব, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে অরণ্য এবং তৃণভূমির উপকার হবে। চাষীরও উপকার হবে। আর লাভ হবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির।

অষ্টম অধ্যায়ে আই পি সি সি-র আরও একটি দাবি যাচাই করে দেখা হয়েছে। আই পি সি সি-র দাবি, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে যে ভাবে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, তাতে স্থলভূমিতে এবং সমুদ্রে প্রচুর প্রাণী এবং উদ্ভিদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই দাবিটির কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। এবং, তথ্যপ্রমাণ বলছে, এর বিপরীতটিই যথার্থ, অর্থাৎ উষ্ণতর এবং অধিক কার্বন ডাই অক্সাইড ঘনত্বসম্পন্ন বিশ্বে জীববৈচিত্র্য বাড়বে।

নবম অধ্যায়ে আই পি সি সি-র আর একটি দাবিকে চ্যালেঞ্জ করা

হয়েছে। দাবিটি হল 'কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে ঘটা বিশ্ব-উষ্ণায়ন মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক'। সাম্প্রতিক কালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, শ্বাসকষ্টজনিত অসুখের বৃদ্ধি, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি বা পীত জ্বরের মহামারীর আকার ধারণ করার কারণ হিসেবে আই পি সি সি তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের তাপমাত্রা যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তা হলে তার ফল ঠিক এর বিপরীত হবে— চরম আবহাওয়ার ফলে জীবনহানির ঘটনা কমবে। আমাদের আলোচনায় আমরা আরও দেখিয়েছি, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তা কী ভাবে বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখেও খাদ্যের জোগান আরও অনেকখানি বাড়াতে পারে। অন্য দিকে, আমরা এটাও দেখিয়েছি যে আই পি সি সি যে জৈব জ্বালানির কথা বলছে, তার উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কী ভাবে তা বাজারে খাদ্যশস্যের জোগান কমিয়ে দেবে এবং তার ফলে কী ভাবে খাবারের দাম বাড়বে।

এই রিপোর্টে যে গবেষণাগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি গোটা দুনিয়া জুড়ে চলা গবেষণার একটি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ, সেগুলির প্রতিনিধি মাত্র। এমন অনেক পাঠক নিশ্চয়ই আছেন, যাঁরা শুধুমাত্র এই রিপোর্টে উল্লিখিত গবেষণাগুলির কথা জেনেই সন্তুষ্ট হবেন না, এ বিষয়ে আরও যে গবেষণা চলছে, সে বিষয়ে জানতে চাইবেন। দ্য সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড গ্লোবাল চেঞ্জ-এর ওয়েবসাইটে (www.co2science.org) এই গবেষণাপত্রগুলির তথ্যপুঞ্জি রাখা হয়। আমাদের রিপোর্টে সেই ইন্টারনেট বেসড ডেটাবেস-এর হাইপারলিঙ্ক দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য

অধ্যায় ১: বিশ্ব-পরিবেশ মডেলসমূহ (গ্লোবাল ক্লাইমেট মডেলস) এবং সেগুলির সীমাবদ্ধতা

● আই পি সি সি-র দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জেনারেল সার্কুলেশন মডেল-এর মাধ্যমে ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তন সম্বন্ধে পূর্বভাস করেছে এবং জলবায়ুতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে, তার দায় মানুষের কাজকর্মের ফলে তৈরি গ্রিনহাউস গ্যাসের ওপর চাপিয়েছে।

● আই পি সি সি-র চতুর্থ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে যে পূর্বভাসগুলি করা হয়েছে, কোনও প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সেগুলিতে উপনীত হওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা এই রকম— বিজ্ঞানীরা যা বলেছেন, তাকে অঙ্কের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে একটা বিদঘুটে ভাষায় লেখা হয়েছে। আই পি সি সি-র বক্তব্য, ওগুলো ভবিষ্যৎবাণী বা ফোরকাস্ট নয়, অনুমান বা প্রজেকশন মাত্র। কিন্তু, যুক্তির এই শাক দিয়ে ভ্রান্তির মাছ ঢাকা মুশকিল।

● আজকের অতি উন্নত স্টেট অব দি আর্ট ক্লাইমেট মডেলগুলিও পৃথিবীর রেডিয়েটিভ এনার্জি ব্যালেন্স-এর প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি, ফলে প্রভূত অনিশ্চয়তা থেকে গিয়েছে। কতখানি? 'কার্বন ডাই অক্সাইড ফোর্সিং-এর দ্বিগুণ হওয়ার সমান, অথবা তারও বেশি'।

● ক্লাউড ফর্মেশন এবং ক্লাউড রেডিয়েশন ইন্টারঅ্যাকশনের হিসেব করার ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত সবক'টি প্রধান মডেলেরই অনেকগুলি খামতি রয়েছে। সেই কারণেই মডেল ব্যবহার করে যে পূর্বভাস পাওয়া যায়, আর বাস্তবে যা ঘটে, এই দুটির মধ্যে অনেক পার্থক্য থেকে যায়।

● পরিবেশ মডেলগুলিতে এমন পর্যয়ে ত্রুটি আছে যে বৃষ্টিপাতের অশ্চিয়তার হিসেব করতে গিয়ে তার চিহ্নেই ভুল থেকে গিয়েছে। যেমন, গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় ভারতীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের কী পরিবর্তন হবে, সেই হিসেবটিই ভুল হয়েছে। এ দিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্নে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য।

অধ্যায় ২ : ফিডব্যাক ফ্যাক্টরস এবং রেডিয়েটিভ ফোর্সিং

● আই পি সি সি-র ব্যবহৃত মডেল পৃথিবীর যে টেম্পারেচার সেনসিটিভিটি নিরূপণ করেছে এবং যেটি আই পি সি সি-র স্বীকৃতি পেয়েছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে সেটি বাস্তবের তুলনায় অনেক বেশি। পরিবেশ ব্যবস্থায় সংশোধিত ফিডব্যাক পৃথিবীর ক্লাইমেট সেনটিভিটির মান অনেকখানি কম এবং বাস্তবোচিত অঙ্কে নিরূপণ করে।

● বিজ্ঞানীরা সম্ভবত ক্রান্তীয় অঞ্চলে সমুদ্রতলের তাপমাত্রা এবং মেঘ সৃষ্টির মধ্যে একটি স্মপর্ক নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দুটির মাধ্যমে ক্রান্তীয় অঞ্চলেথার্মোস্ট্যাটের মতো একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যাতে ভূপৃষ্ঠে প্রযোজনের অতিরিক্ত তাপ তৈরি হলে তা মহাশূন্যে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

● আই পি সি সি-র রিপোর্টে বায়ুতে ভাসমান কণার শীতল করার ক্ষমতাকে তার প্রাপ্য গুরুত্বের কণামাত্র দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রাক-শিল্পায়ন যুগ থেকে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যতখানি বেড়েছে, এই কণাগুলির রেডিয়েটিভ এফেক্ট তার তুলনীয়, অথবা তার চেয়েও বেশি।

● তাপমাত্রা বাড়লে সমুদ্র থেকে ডাইমিথাইল সালফাইড নিঃসরণের পরিমাণ বাড়ে। এই গ্যাসটি মেরিন স্ট্রেটাস ক্লাউড-এর তাপ প্রতিফলনের ক্ষমতা বাড়ায়। তাপ প্রতিফলিত হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা কম রাখার ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে।

● সামুদ্রিক ক্ষুদ্র উদ্ভিদ (অ্যালগি) থেকে উৎপন্ন আয়োডোকম্পাউন্ড মেঘের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এর ফলে নতুন মেঘের জন্ম হয় এবং তা আরও বেশি সৌর বিকিরণকে প্রতিফলিত করে ফেরত পাঠায়, ফলে ভূপৃষ্ঠ শীতল থাকে।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব, এবং সম্ভবত বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, যত বাড়তে থাকে, উদ্ভিদের থেকে বেশি পরিমাণ কর্বোনাইল সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস শেষ পর্যন্ত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছোয় এবং সালফেট কণায় পরিণত হয়। এই কণাগুলি সূর্যের বিকিরণকে প্রফিলিত করে এবং তার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বাড়ে। তার ফলে পরিবেশে বায়োসলের ঘনত্বও বাড়ে। অনেক বায়োসলই মেঘ জমাট বাঁধতে সহায়তা করে। পরিবেশ মেঘলা হলে সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে গাছপালার বৃদ্ধি ভাল হয়। গাছপালার সংখ্যা বাড়লে পরিবেশের কার্বন তাতে এবং মাটিতে সঞ্চিত হতে থাকে।

বিশ্বের বেশ কিছু দেশে মোট নাইট্রাস অক্সাইডের (N_2O) প্রায় অর্ধেকই আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। কাজেই এমন একটি আশঙ্কা আছে যে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে গাছপালার বৃদ্ধির হার ভাল হলে এই বিশেষ গ্রিনহাউস গ্যাসটির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু, গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব এবং ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়লে এই বিশেষ গ্রিনহাউস গ্যাসটির নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস পায়। পরিবেশের ওপর কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির এ আর একটি সুপ্রভাব।

মিথেন (CH_4) একটি বিপজ্জনক গ্রিনহাউস গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে মিথেনের ঘনত্বের ওপর কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির 'কোনও ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব নেই' বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। অন্য দিকে, দেখা গিয়েছে যে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়লে পিট বেড থেকে মিথেন নিঃসরণের হার হ্রাস পায়। গবাদি পশুর পাকক্রিয়ার ফলে যে মিথেন উৎপন্ন হয়, তা ইতিমধ্যেই খাদ্য পরিবর্তন, টীকা এবং জিনগত নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

অধ্যায় ৩: তাপমাত্রা সংক্রান্ত নথির পর্যালোচনা

● আই পি সি সি-র দাবি, তারা অতীতের তাপমাত্রা সংক্রান্ত নথি পরীক্ষা করে দেখেছে যে বিংশ শতাব্দীতে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার 'অভূতপূর্ব' এবং গত ১৩০০ বছরে কখনও এই হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু, এই দাবির পক্ষে আই পি সি সি যে প্রমাণগুলির কথা উল্লেখ করে, যার মধ্যে মান এবং অন্যান্যদের হকি স্টিক থিয়োরিও রয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছেন এবং অনেকেই সেগুলিকে ভ্রান্ত হিসেবে বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছেন।

● অতীতের তাপমাত্রা সংক্রান্ত সংশোধিত নথি থেকে জানা যায় যে আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে পৃথিবীতে আজকের তুলনায় উষ্ণতর একটি যুগ, বিশ্ব মদ্যযুগীয় উষ্ণ যুগ (ওয়ার্ল্ড মেডিয়াভাল ওয়ার্ম পিরিয়ড), ছিল। এবং, গত দশ হাজার বছরের গড় তাপমাত্রা আজকের তাপমাত্রার তুলনায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি।

● বিশ্ব মধ্যযুগীয় উষ্ণ যুগ সম্বন্ধে পাকা এবং প্রশ্নাতীত প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে যে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন, তাঁরা আফ্রিকা, আন্টার্কটিকা, দি আর্কটিক, এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পাওয়া প্রক্সি রেকর্ড-এ এই প্রমাণ পেয়েছেন।

● ভূপৃষ্ঠস্থিত রেকর্ডিং স্টেশন থেকে পাওয়া আধুনিক উষ্ণায়ন সংক্রান্ত তথ্য বলছে, ১০০৫ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ০.৭৪° সেন্টিগ্রেড +/- ০.১৮° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, এই তথ্য ভ্রান্ত, কারণ গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবহীন আর্বান হিট আইল্যান্ড (ইউ এইচ আই) এফেক্ট-এর জন্য পরিসংখ্যানটি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ সংশোধিত হয়নি। এই ভ্রান্তির কথা সর্বজনবিদিত। এই ভ্রান্তিটি সম্ভবত সংশোধনের অযোগ্য। একটি ছোট শহরেও আর্বান হিট আইল্যান্ড (ইউ এইচ আই) এফেক্ট এত বেশি যে তার পাশ গ্রিনহাউস গ্যাসের ফলে হওয়া সম্ভাব্য তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর দেখাবে।

● অরবিট ড্রিফ্ট এবং অন্যান্য কারণের ফলে ঘটা বিচ্যুতিকে হিসেব করে বাদ দেওয়ার পর যে অত্যন্ত নিখুঁত উপগ্রহ পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে, বিশ শতকে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ঢের কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একুশ শতকের প্রথম দশকটিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার নাটকীয় ভাবে কমেছে।

● কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে বিশ্বের তাপমাত্রা কী ভাবে বাড়বে, তা অনুমান করার জন্য আই পি সি সি গ্লোবাল ক্লাইমেট মডেল ব্যবহার করে। সেই মডেল তাপমাত্রা বৃদ্ধির ধরন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছে, তার থেকে বিংশ শতাব্দীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফিঙ্গারপ্রিন্ট অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রকৃত ধরন স্পষ্টতই আলাদা। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউ এস ক্লাইমেট চেঞ্জ সায়েন্স প্রোগ্রাম (সি সি এস পি)-র গবেষণা স্পষ্ট বলছে: সব গ্রিনহাউস মডেলের ফলাফলই তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বভাস করেছে এবং জানিয়েছে ক্রান্তীয় অঞ্চলে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি সর্বাধিক হবে। ভূপৃষ্ঠের দশ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ হবে, যা ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার মোটামুটি দ্বিগুণ। কিন্তু, বেলুন থেকে তাপমাত্রা সংক্রান্ত যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, তা উল্টো কথা বলছে— উষ্ণায়ন ঘটছে না, বরং উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা সামান্য হলেও কমছে।

● গ্রিনল্যান্ড এবং উত্তর মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রার পরিসংখ্যান বলছে, সে অঞ্চলে ১৯৩০-এর দশকে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল এবং তার পর থেকে তাপমাত্রা ক্রমে কমছে। আরও দীর্ঘমেয়াদি তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মিড হোলোসিন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৯০০০ থেকে ৫০০০, যখন তাপমাত্রা আজকের তুলনায় ২.৫° সেন্টিগ্রেড বেশি ছিল) পর্যায়ের চরম পরিবেশের পর থেকে তাপমাত্রা বাড়া কমার মাধ্যমে ক্রমে কমেছে।

● দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের গড় তাপমাত্রার পরিসংখ্যানে বিশ শতকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সপক্ষে কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলা অঞ্চলে সাম্প্রতিক কালে উষ্ণায়ন ঘটেছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন গবেষকদের দল জানিয়েছে, এই মহাদেশের অভ্যন্তরে ১৯৭০-এর দশকের পর থেকে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অধ্যায়৪: হিমবাহ, সামুদ্রিক বরফ, বৃষ্টিপাত এবং সমুদ্রতল বিষয়ক পর্যবেক্ষণ

● গোটা দুনিয়াতেই হিমবাহগুলি ক্রমাগত জমে এবং গলতে থাকে। ক্ষুদ্র বরফ যুগ (লিটল আইস এজ)-এর পর থেকেই হিমবাহগুলিতে

গলনের একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। শিল্পায়ন-পরবর্তী যুগে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হিমবাহগুলির গলনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন কোনও তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং, অনুমান করা চলে, হিমবাহের গলনের ওপর কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির কোনও প্রভাব নেই।

● গত কয়েক দশকে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সামুদ্রিক বরফে ঢাকা এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর মেরু অঞ্চলে সামুদ্রিক বরফের আস্তরণ পাতলা হয়ে আসা নিয়ে যে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, সেই ঘটনাটির কারণ ভিন্ন। ১৯৯০-এর দশকে উত্তর মেরুর সমুদ্রে বরফের স্তরে গলন আরম্ভ হয়। তথ্য প্রমাণ বলছে, সেটি ঘটেছিল পরিবেশের কিছু বিশেষ পরিবর্তনের ফলে বরফের নিজস্ব নিয়ম মেনেই। অতীতে, গত বেশ কিছু দশক ধরেই, এমন ঘটনা ঘটেছে এবং অনুমান করা চলে যে তা ভবিষ্যতেও ঘটবে। এর সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। ২০০৭ সালে উত্তর মেরু অঞ্চলে সামুদ্রিক বরফের যে গলন ঘটেছিল, তার অনেকটাই ফের পূরণ হয়ে গিয়েছে বলেই দেখা যাচ্ছে।

● বিশ্ব জুড়ে বৃষ্টিপাতের ধরন নিয়ে যে গবেষণা চলছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়েনি, অথবা তার ধরনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। ক্লাইমেট মডেলগুলি যে পূর্বাভাস করে, অর্থাৎ উষ্ণায়ন ঘটলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে, এই তথ্য প্রমাণ তার বিপরীত দিকে নির্দেশ করে। আফ্রিকা, উত্তর মেরু, এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, সর্বত্রই বৃষ্টিপাতের ধরন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কোথাও এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যার ভিত্তিতে বলা চলে যে মানুষের কাজকর্মের ফলে যে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে, তার ফলে বৃষ্টিপাতের ধরনে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে।

● ১৯৫১ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে গোটা দুনিয়ায় সব নদীর জলপ্রবাহ কার্যত (অর্থাৎ, সংখ্যাতত্ত্বের প্রেক্ষিতে) অপরিবর্তিত থেকেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত আই পি সি সি-র কম্পিউটার মডেলগুলি পূর্বাভাস করেছিল, উষ্ণায়ন ঘটলে নদীতে জলপ্রবাহের পরিমাণে প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। বাস্তব পর্যবেক্ষণ এই দাবিটিকে অসার প্রতিপন্ন করে। অতীতে, যখন তাপমাত্রা আজকের চেয়ে বেশি ছিল, তখন যে পরিমাণ খরা ও বন্যা ঘটত, আজকের উষ্ণ যুগে খরা ও বন্যার সংখ্যা এবং ভয়াবহতা তার তুলনায় ঢের কম।

● কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে হওয়া উষ্ণায়ন গ্রিনল্যান্ড এবং দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বরফের আস্তরণের মারাত্মক ও বিধ্বংসী ক্ষতি করবে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই দাবিটির তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। বস্তুত, দক্ষিণ মেরুর ক্ষেত্রে এই গবেষণাগুলির ফল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে নির্দেশ করে। গবেষণা বলছে, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে ঘটা বিশ্ব উষ্ণায়ন পৃথিবীকে এই জাতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করতেই সহায়ক হবে।

● গোটা দুনিয়ায় সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক অতীতে বৃদ্ধি পায়নি। কেন সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, সেই কারণগুলি এখনও স্পষ্ট নয়। তার কারণ, সমুদ্রের জলের ভারসাম্য এবং গ্রিনল্যান্ড ও দক্ষিণ মেরুর বরফের গলনের ফলে সমুদ্রে যোগ হওয়া জল সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক মাপকাঠি সম্বন্ধেই যথেষ্ট ধোঁয়াশা আছে। যতক্ষণ না এই ধোঁয়াশা কাটছে, ততক্ষণ অবধি স্পষ্ট করে বোঝা সম্ভব নয় যে তাপমাত্রার সাময়িক পরিবর্তন সমুদ্রতলের উচ্চতার ওপর কী প্রভাব ফেলছে।

অধ্যায় ৫: সৌরমণ্ডলের বিবিধ পরিবর্তন (সোলার ভেরিয়্যাবিলিটি) এবং জলবায়ুচক্র (ক্লাইমেট সাইকলস)

● আই পি সি সি জানিয়েছে, ১৭৫০ সালের পর থেকে সূর্যের আউটপুটের ফলে হওয়া রেডিয়েটিভ ফোর্সিং-এর মান +০.১২ Wm^{-2}, যা সংস্থাটির হিসেবে অ্যানথ্রপোজেনিক ফোর্সিং-এর মানের (+১.৬৬Wm^{-2}) তুলনায় অনেকটাই কম। অনেকগুলি গবেষণার ফল বলছে, আই পি সি সি-র এই সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত। গত একশো বছর বা তারও বেশি সময় ধরে জলবায়ুতে যে পরিবর্তন হয়েছে, তার সিংহ ভাগের জন্য সূর্যের প্রভাব দায়ী।

● প্রতি সৌরচক্রে (সোলার সাইকেল) সূর্যের মোট এনার্জি আউটপুটে ০.১ শতাংশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, বহু শতকের প্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন তুলনায় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য দিকে, সূর্যের অতিবেগুনি বিকিরণের (আল্ট্রা ভায়োলেট রেডিয়েশন) পরিমাণ এক সৌরচক্রে বেশ কয়েক শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে— স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন স্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করলে এর প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হয় সৌরপ্রবাহে (সোলার উইন্ড) এবং বিভিন্ন গ্রহের মধ্যকার চৌম্বক ক্ষেত্রে (ইন্টারপ্ল্যানেটরি ম্যাগনেটিক ফিল্ড)।

● অতীতের জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে যদি অতীতের জলবায়ুর পুনর্নির্মাণ (রিকনস্ট্রাকশন) করার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে, সূর্যের চৌম্বক ক্রিয়া ও সূর্যের ইর‍্যাডিয়েন্স (বা ঔজ্জ্বল্য) এবং ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (ক্লোজ কোরিলেশন) রয়েছে। কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার মধ্যে যে কোরিলেশন রয়েছে, তার তুলনায় এই কোরিলেশন অনেক বেশি।

● সূর্যের বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর জলবায়ু কী ভাবে প্রভাবিত হবে, তা বিভিন্ন মহাজাগতিক রশ্মি নির্ধারণ করে দিতে পারে। যখন সূর্যের চৌম্বক ক্রিয়া (ম্যাগনেটিক অ্যাকটিভিটি) বৃদ্ধি পায়, তখন পৃথিবীর আবরণ দৃঢ়তর হয়, ফলে অপেক্ষাকৃত কম মহাজাগতিক রশ্মি সেই আবরণ ভেদ করে ভূপৃষ্ঠের নিকটতর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। তার ফলে মেঘ জমাট বাঁধানোর নিউক্লিয়াই কম উৎপন্ন হয় তার ফলে নীচু মেঘের ঘনত্ব কমে ও তার প্রতিফলন ক্ষমতাও কমে। তার ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ সৌর বিকিরণ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছোয় এবং শোষিত হয়। তার ফলে ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন হয়।

● পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই সৌরমণ্ডলের বিবিধ পরিবর্তনের সঙ্গে

বৃষ্টিপাত, খরা, বন্যা এবং বর্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (স্ট্রং কোরিলেশন) লক্ষ্য করা গিয়েছে। আবারও, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে এগুলির কোরিলেশন যত, তার তুলনায় সৌরমণ্ডলের পরিবর্তনের সঙ্গে এগুলির কোরিলেশন অনেক বেশি।

● জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর সূর্যের বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রভাব এমনই জটিল যে সোলার ফোর্সিং সংক্রান্ত বেশির ভাগ তত্ত্বকেই এখনও 'অপ্রমাণিত' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু, একই সঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে বিজ্ঞানীদের স্বীকার করা উচিত, সাম্প্রতিক বিশ্ব উষ্ণায়নের পিছনে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির প্রভাব সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রেও এই কথাটি সমান ভাবে প্রযোজ্য।

অধ্যায় ৬: চরম আবহাওয়া বিষয়ক পর্যবেক্ষণ

● আই পি সি সি-র পূর্বাভাস, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়লে বিশ্বের আবহাওয়াও ক্রমে চরম হবে। সেই চরম আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য হল বন্যা, খরা, সামুদ্রিক ঘূর্নিঝড়, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ঝড়, তুষারপাত, তুষারঝড়, দাবানল ইত্যাদির সংখ্যা এবং ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাওয়া। আই পি সি সি-র দাবি গত শতকে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা অভূতপূর্ব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দুই হাজার বছরে নাকি কখনও এত দ্রুত হারে তাপমাত্রা বাড়েনি। প্রশ্ন হল, গত এক শতকে আবহাওয়ায় কি এমন কোনও পরিবর্তন ঘটেছে যা থেকে বলা যেতে পারে যে সত্যিই এমন চরম আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে?

● বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে খরার তীব্রতা বাড়েনি, খরা আরও বেশি অনিয়মিতও হয়ে ওঠেনি। আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং অন্যত্র যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তার থেকে এই কথা বলার উপায় নেই যে খরার সংখ্যা বাড়ছে, বা তা আরও তীব্র হয়ে উঠছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, জলবায়ুবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে যে খরাগুলি 'মারাত্মকতম' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলির তীব্রতাও অপেক্ষাকৃত শীতল যুগে ঘটা খরার তীব্রতার তুলনায় ঢের কম।

● আজকের বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগের তুলনায় ক্ষুদ্র বরফ যুগে বন্যার সংখ্যা এবং তীব্রতা অনেক বেশি ছিল। বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বন্যার সংখ্যা কমেছে, তার তীব্রতাও কমেছে।

● আই পি সি সি-র রিপোর্ট বলছে, 'সমুদ্রতলের উষ্ণতা যে ভাবে বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে ক্রান্তীয় ঘূর্নিঝড়ের (টাইফুন এবং হ্যারিকেন) তীব্রতা বাড়বে, ঝড়গুলির গতিবেগ বেশি হবে এবং ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বাড়বে'। আই পি সি সি-র রিপোর্টই বলছে, বিশ শতকে নাকি ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অভূতপূর্ব ভাবে বেড়েছে। তা-ই যদি হয়, তা হলে গোটা বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়া জুড়ে, বা কোনও একটি মহসাগরে, ঘূর্নিঝড়ের সংখ্যা বা তীব্রতা বাড়ল না কেন?

●একাধিক পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এল নিনো-সাদার্ন অসিলেশন (ই এন এস ও)-র অবস্থা, তার সংখ্যা বা তীব্রতার প্রেক্ষিতে, অভূতপূর্ব কিছু নয়। অতীতের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবী যে সময়ে আজকের তুলনায় বেশ অনেকটাই গরম ছিল, তখন ই এন এস ও-র সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কম ছিল, এবং কখনও কখনও ছিলই না।

● মডেল ভিত্তিক পূর্বাভাস হল, ভূপৃষ্ঠ উষ্ণতর হলে বৃষ্টিপাত আরও অনিয়মিত হবে এবং তার তীব্রতাও বাড়বে। এই দাবিটির সপক্ষে কোনও বাস্তব প্রমাণ নেই। বস্তুত, বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য প্রমাণ বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই তথ্য প্রমাণগুলি এই বক্তব্যকেই সমর্থন করছে যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সৌরজগতের বিভিন্ন পরিবর্তনচক্রের উপর অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল।

● ক্ষুদ্র বরফ যুগ শেষ হওয়ার পর থেকে গত ১৫০ বছরে পৃথিবী ক্রমেই উষ্ণ হয়েছে। এই সময়কালে ঝড়ের সংখ্যা বা তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন কোনও প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

● ১৯৫০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব অন্তত ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়কালে উত্তর আমেরিকায় তুষারপাত আরমথ হওয়ার গড় তারিখ এবং বরফ পড়ার মোট সময়ের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। অন্য দিকে, এই সময়কালেই তুষারঝড়ের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে।

● কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে নিম্নচাপের কারণে জলস্তর বৃদ্ধির ঘটনার (স্টর্ম সার্জ) সংখ্যা বা তীব্রতা বৃদ্ধি পায়নি। যে স্টর্ম সার্জগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তার বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে তীব্রতা অপেক্ষাকৃত ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

● সব সময়েই দেখা গিয়েছে, বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা *বৃদ্ধি* পেলে বায়ুর তাপমাত্রার তারতম্য (এয়ার টেম্পারেচার ভেরিয়্যাবিলিটি) *হ্রাস পায়*। বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি হাজার হাজার বছর ধরে ঘটুক, কয়েক দশকের ব্যবধানে ঘটুক অথবা ভিন্ন ই এন এস ও অবস্থা থাকার ফলে একটি উষ্ণ এবং একটি শীতল বছরের ব্যবধানেই ঘটুক, তাপমাত্রার তারতম্য হ্রাস পাওয়ার ঘটনাটি ঘটবেই। কাজেই, বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদ প্রমাণ করার জন্য নিয়মিত যে দাবিটি করা হয়, অর্থাৎ উষ্ণায়ন ঘটলে জলবায়ু ও আবহাওয়া চরমতর হবে এবং তাপমাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিও চরম হবে, এই দাবিটির সপক্ষে বাস্তবে কোনও প্রমাণ নেই।

● এটা সত্যি যে গত দুই তিন দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দাবানলের কারণে জমির পরিমাণ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়েছে বা কমেছে। কিন্তু, গোটা পৃথিবীর কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে, দাবানলের ফলে পুড়ে যাওয়া জমির পরিমাপের সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের কোনও সম্পর্ক নেই।

অধ্যায় ৭: জীবজগতের ওপর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির প্রভাব

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ৩০০ পি পি এম বৃদ্ধি পেলে লতাপাতাজাতীয় উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা প্রায় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পায় বলে দেখা গিয়েছে। যে উদ্ভিদগুলি সালোকসংশ্লেষের তিনটি প্রধান পথই (C_3, C_4, CAM) ব্যবহার করে, সেগুলির ক্ষেত্রে কার্বন

ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার এই ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে। বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সুপ্রভাব আরও বেশি। জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির সুপ্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

● বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে উদ্ভিদের জল ব্যবহারের কুশলতা (ওয়াটারইউজ এফিশিয়েন্সি) বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদের জল ব্যবহারের কুশলতার অর্থ, প্রতি একক জল বর্জন করে উদ্ভিদ যত একক কার্বন লাভ করে। পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বেশি থাকলে উদ্ভিদের পক্ষে কম জল বর্জন করে প্রয়োজনীয় কার্বন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ফলে, উদ্ভিদের খরার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়াও, গাছের কার্বন ডাই অক্সাইড প্রভাবিত বায়োমাস উৎপাদনের ক্ষমতা জলের প্রাচুর্যসম্পন্ন গাছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম জল পাওয়া গাছের ক্ষেত্রে বেশি হয়।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে গাছের মধ্যে কয়েকটি মারাত্মক প্রাকৃতিক সমস্যার সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা বাড়ে। এই সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে মাটির অতিরিক্ত লবণাক্ত হয়ে পড়া, বায়ুর উচ্চ চাপ, আলোর কম তীব্রতা এবং মাটির কম উর্বরতা। এই সমস্যাগুলি গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক। এ ছাড়াও দেখা গিয়েছে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তা উদ্ভিদের উপর বায়ুর নিম্ন চাপজনিত প্রভাব, জারণজনিত প্রভাব এবং পরজীবী প্রাণীর উপস্থিতিজনিত প্রভাবের তীব্রতা কমাতে সহায়ক হয়। বস্তুত, লক্ষ করা গিয়েছে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির ওপর তা যে সুপ্রভাব পড়ে, তা গাছের বৃদ্ধির আদর্শ পরিস্থিতি থাকলে যত বেশি হয়, তার চেয়ে বেশি হয় প্রতিকূল পরিবেশে।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব যে ভাবে বৃদ্ধি পাবে, অনুমান করা চলে, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের হার এবং বায়োমাস উৎপাদনের হারও সে ভাবেই বাড়বে। যদি বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটেও, তাতে এই বৃদ্ধির হার কোনও মতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বস্তুত, যদি ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তবে কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি-অনুকূল প্রভাব আরও বাড়বে, এবং তা ক্রমেই বাড়তে থাকবে।

● বিজ্ঞানীদের অনুমান, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি কৃষিশস্য বা উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে যতখানি সহায়ক হবে, আগাছার বৃদ্ধির পক্ষে ততখানি সহায়ক হবে না।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তা উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয় দুটি কারণে— এক, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়ার ফলে দিনের বেলা সালোকসংশ্লেষের নেট হার বৃদ্ধি পায়; দুই, কার্বন ডাই অক্সাইডের অধিক ঘনত্ব রাতের বেলা গাছের শ্বাস প্রশ্বাসের হার কমিয়ে রাখে।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যতটুকুই উষ্ণায়ন হোক না কেন, তার কোনও প্রভাব পৃথিবীর মাটির জৈব পদার্থের পচনের (ডিকম্পোজিশন) হারের ওপর পড়বে না। বরং, এর ফলে সম্ভবত পরিবেশে জৈব ভাবে কার্বন আত্মীয়করণের হার বৃদ্ধি পাবে। বায়ুমণ্ডলে যদি কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়তেও থাকে, তা হলেও পৃথিবীর পিটল্যান্ডগুলি থেকে প্রবল হারে কার্বন ক্ষয় হবে না। বরং, তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে। যদি সত্যিই কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়তে থাকে, তা হলে এই পিটল্যান্ডগুলিতে কার্বন ঘনত্বও বাড়বে।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে পৃথিবীতে প্রাণের ওপর তার আর যে সুপ্রভাবগুলি পড়বে, তার কয়েকটি হল— গাছের নাইট্রোজেন ব্যবহারের কুশলতা (নাইট্রোজেন ইউজ এফিশিয়েন্সি) বৃদ্ধি পাবে, মাটিতে কার্বন কণা আরও বেশি সময় ধরে থাকবে, মাটিতে কেঁচো এবং কেন্নোর সংখ্যা বাড়বে।

● বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার দুটি প্রভাব উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এক দিকে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উর্বরতা সার্বিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (যার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেড়েছে), অন্য দিকে গাছের জলমোচনের হার কার্বন ডাই অক্সাইডের অধিকতর ঘনত্বের প্রভাবে কমেছে (যার ফলে গাছের জল ব্যবহারের কুশলতা বা ওয়াটার ইউজ এফিশিয়েন্সি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাতে এখন এমন এমন জায়গায় গাছ জন্মাচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে জায়গাগুলো আগে খুব বেশি উষর ও শুষ্ক হিসেবে বিবেচিত হত)। এই দুটি প্রভাবের দৌলতে গোটা দুনিয়াতেই নতুন করে অরণ্যায়ন ঘটছে। যে জায়গার পরিবেশ আগে গাছের জন্মের পক্ষে অতি প্রতিকূল ছিল, সেখানেও এখন সবুজের অভিযান চলছে। সব মিলিয়ে, পৃথিবী আগের চেয়ে বেশি সবুজ হয়ে উঠছে।

● ওজোন দূষণ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ, বৃদ্ধি এবং ফসলের উপর যে খারাপ প্রভাব ফেলে, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তা সেই খারাপ প্রভাবের অনেকখানি কাটিয়ে দেয়। অধিকাংশ সময়েই দেখা গিয়েছে, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির সামগ্রিক সুফল ওজোন দূষণের কুফলকে অতিক্রম করে যায়। দেখা গিয়েছে, কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়লে পরিবেশে আইসোপ্রিন-এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। আইসোপ্রিন হল একটি অতি তেজস্ক্রিয় নন-মিথেন হাইড্রোকার্বন। বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে এই গ্যাসটি প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসটিই বিপুল পরিমাণ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক ওজোন উৎপাদনের জন্য দায়ী।

অধ্যায় ৮: বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি

● আই পি সি সি-র দাবি, 'নতুন কিছু প্রমাণ বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং আরও কিছু বিলুপ্ত হওয়ার মুখে' এবং 'পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের উপর এর প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি অপূরণীয় (ভেরি হাই কনফিডেন্স)'। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অবশ্য এই দাবির সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই।

● পৃথিবীর মাটিতে যে প্রাণীরা বাস করে, দীর্ঘ দিনের পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, তারা জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে অত্যন্ত দক্ষ ভাবে মানিয়ে

নিতে পারে। বন্য প্রাণীর বেশির ভাগ প্রজাতিই, প্রজাতি হিসেবে, দশ লক্ষ বছরেরও বেশি পুরনো। অর্থাৎ, এই প্রজাতিগুলি অনেক জলবায়ুচক্র অতিক্রম করে এসেছে। বিংশ শতাব্দীতে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যতখানি বাড়ছে, এই জলবায়ুচক্রগুলির অনেকগুলিতেই তাপমাত্রা পরিবর্তন তার সমান বা তার চেয়ে বেশি হয়েছিল।

● কোনও বিশেষ প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তির চারটি প্রধান কারণ আছে— কোনও বিপুল আয়তনের মহাজাগতিক বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ, মানুষের করা শিকার, কৃষি এবং কোনও অঞ্চলে বাইরে থেকে আনা কোনও বিশেষ প্রাণীর দৌলতে (যেমন, আমেরিকার গ্রেট লেকস-এ ল্যামপ্রেইল ছাড়ার ফলে সেখানকার স্বাভাবিক মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছিল, অথবা হাওয়াই-এ শুয়োর ছাড়ার ফলে সেখানের বেশ কিছু পাখির প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে)। এই চারটি কারণের একটির সঙ্গেও ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি অথবা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

● ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম-এর সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী শতকগুলির মধ্যে বিংশ শতাব্দীতেই প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তির হার সবচেয়ে কম। মনে রাখা ভাল, ১৫০ বছর ব্যাপী তাপমাত্রার বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, এবং শিল্পায়ন সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতেই বিলুপ্তির সর্বনিম্ন হার পরিলক্ষিত হয়েছে। বেশির ভাগ প্রজাতির প্রাণীই, বা সম্ভবত সব প্রজাতির প্রাণী, বিংশ শতকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উপকৃত হয়েছে।

● তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বও বাড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেশির ভাগ প্রজাতির গাছের ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলে মাইগ্রেট করার প্রয়োজন পড়বে না। গাছগুলির শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার এমন কিছু পরিবর্তন ঘটবে যাতে সেগুলি উষ্ণতর পরিবেশেই মানিয়ে নিতে পারবে। কোল্ড লিমিটেড বাউন্ডারি অঞ্চলে ক্রমে মেরুর দিকে এবং উঁচু অঞ্চলে গাছের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, কারণ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সেই অঞ্চলে তুষারের পরিমাণ কমবে, গাছের বৃদ্ধির সময়কাল বাড়বে। হিট লিমিটেড বাউন্ডারি অঞ্চলে অরণ্যের অবস্থান মোটামুটি একই থাকবে, অথবা তাতে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

● স্থল অঞ্চলের প্রাণীরাও ক্রমে মেরুর দিকে এবং উঁচু অঞ্চলে বাস করতে আরম্ভ করবে। এত দিন তাপমাত্রার কারণে সেই অঞ্চলগুলি এই প্রাণীদের বসবাসের অযোগ্য ছিল। শীতল অঞ্চলে এই প্রাণীগুলি উদ্ভিদের চলনের অনুকরণ করবে, এবং উক্ত অঞ্চলে এদের বসবাসের এলাকা কার্যত অপরিবর্তিত থাকবে।

● যে ভূপ্রাকৃতিক যুগে ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা আজকের তুলনায় দশ থেকে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বও আজকের তুলনায় দুই তেকে সাত গুণ বেশি ছিল, সেই যুগেও কোরাল রিফ-এর অস্তিত্ব ছিল। এর থেকেই বোঝা যায়, এই কোরাল রিফ পৃথিবীর পরিবেশের বহু নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

● আই পি সি সি-র ভবিষ্যৎবাণী, বর্তমান শতাব্দীর শেষে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা ১৮ থেকে ৫৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়বে। কোরাল রিফ-এর উচ্চতা প্রতি বছর গড়ে ২ থেকে ৬ মিলিমিটার বৃদ্ধি পায়। হোলোসিন-এর সময় এই হার ছিল বছরে ৭ থেকে ৮ মিলিমিটার। কিছু বিশেষ প্রজাতির কোরাল-এর ক্ষেত্রে এই হার দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। সুতরাং, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলেও তা কোরাল রিফ-এর অস্তিত্বকে সংকটে ফেলবে না বলেই অনুমান করা চলে।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমুদ্রের জলে এমন কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন হতেও পারে যা কোরাল রিফ-এর বৃদ্ধির হারের উপর সামান্য ঋণাত্মক প্রভাব ফেলবে। কিন্তু, একই সঙ্গে জলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার যে সুপ্রবাব এই কোরাল রিফ-এর উপর পড়বে, তা সেই সামান্য ঋণাত্মক প্রভাবের তুলনায় ঢের বেশি হবে বলেই অনুমান করা চলে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যান বলছে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বেশির ভাগ কোরাল-এর ওপরেই ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

● তুষার ভল্লুকদের (পোলার বেয়ার) অস্তিত্বও কি বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিপন্ন হতে পারে? না। কারণ, বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয়েছে, অথবা ভবিষ্যতেও যে পরিবর্তন হতে পারে বলে আই পি সি সি-র কম্পিউটার-মডেল জানিয়েছে, তুষার ভল্লুকরা অতীতে তার চেয়ে ঢের বড় জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে।

● পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে তুষার ভল্লুকের দেখা পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগ অঞ্চলেই এই প্রজাতিটির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে না, বরং বাড়ছে। বস্তুত, তুষার ভল্লুকের অস্তিত্বের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদটির নাম পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি নয়, বরং মানুষের শিকার। ঐতিহাসিক ভাবেই তুষার ভল্লুকের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে শিকারীর দলগুলি।

● তুষার ভল্লুকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া নিয়ে যে ভবিষ্যৎবাণী আই পি সি সি করেছে, তার ভিত্তি কী? সমুদ্রের বরফের গলন ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ ধরন সংক্রান্ত কিছু ভ্রান্ত অনুমান, এবং এমন কম্পিউটার ক্লাইমেট মডেল যার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে ঢের প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে এবং যা বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্বাভাসের কিছু প্রাথমিক শর্তকেই লঙ্ঘন করে।

অধ্যায় ৯: মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

● আই পি সি সি-র অভিযোগ, 'জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গোটা দুনিয়াতেই রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে এবং অসময়ে মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে' এবং তা 'অপুষ্টি ও সেই সংক্রান্ত সমস্যার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তুলবে'। বাস্তবে এমন প্রমাণ অজস্র, যেগুলি একেবারে বিপরীত কথা বলছে। এখন যে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে ব্যাহত না করেই বিশ্বের

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্যের সংস্থান করা যাচ্ছে, তার পিছনে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির প্রভাব অনস্বীকার্য।

● শীতল আবহাওয়া ও কম তাপমাত্রার কারণে যে হৃদরোগ হয়, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে তার প্রকোপ অনেকখানি কমেছে। উষ্ণ তাপমাত্রা এবং তাপপ্রবাহের ফলে কিছু ধরনের হৃদরোগ বেড়েছে বটে, কিন্তু সেই বৃদ্ধি উষ্ণায়নের ফলে কমা হৃদরোগের তুলনায় সামান্যই।

● তাপমাত্রা যত বাড়ে এবং তাপমাত্রার তারতম্য যত কমে, ততই শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মৃত্যুর ঘটনাও কমে। ● যারা বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদঘণ্টা বাজাতে পছন্দ করেন, তাঁরা অনেক সময় দাবি করেন, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ম্যালেরিয়া এবং পরজীবী কীট বাহিত অন্যান্য রোগব্যাধি গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। এই দাবির সপক্ষে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

● তাপমাত্রাজনিত বিবিধ মৃত্যুর ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, উষ্ণতর আবহাওয়াতেই এই জাতীয় মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত ভাবে কম থাকে। বিংশ শতাব্দীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এই জাতীয় মৃত্যুর হারে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি।

● বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গত দেড়শো বছরে ফসলের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তার ফলে মানুষের পুষ্টির সার্বিক ছবিটি ভাল হয়েছে। কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে গত ১৫০ বছরে বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন যে ভাবে বেড়েছে— গম বেড়েছে ৭০ শতাংশ, খাদ্যশস্য ২৮ শতাংশ, ফলের উৎপাদন বেড়েছে ৩৩ শতাংশ, দানাশস্য ৬২ শতাংশ, মূলজাতীয় শস্য ৬৭ শতাংশ এবং সবজির উৎপাদন বেড়েছে ৫১ শতাংশ।

● ভবিষ্যতে যখন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব অতীতের তুলনায় বেশি হবে, তখন যে ফসল উৎপন্ন হবে, তা পুষ্টিগত দিক থেকে অর্থাৎ প্রোটিন-এর পরিমাণে, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট (ভিটামিন)-এর পরিমাণে অতীতের তুলনায় নিকৃষ্ট হবে না। বরং, অনুমান করা যেতে পারে, পুষ্টিগত ভাবে তা অতীতের তুলনায় উন্নততর মানের হবে।

● তথ্য প্রমাণ বলছে, ভবিষ্যতে উদ্ভিদে বেশ কিছু ভেষজ গুণসম্পন্ন উপাদান অধিকতর ঘনত্বে এবং অধিকতর পরিমাণে পাওয়া যাবে। আজকের তুলনায় তা নিঃসন্দেহে বেশি হবে।

● শিল্পায়ন-পরবর্তী যুগে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সম্ভবত মানুষের আয়ুও ক্রমে দীর্ঘ হয়েছে। অনুমান করা চলে, ভবিষ্যতে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব আরও বাড়লে তার এই বিশেষ সুপ্রভাবটিও তাল মিলিয়ে বাড়বে।

● ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং পৃথিবীর প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা, এই দুটি লক্ষ্যের মধ্যে একটি অনিবার্য দ্বন্দ্ব আছে। সেই দ্বন্দ্বকে কমিয়ে আনার তিনটি সম্ভাব্য পথ রয়েছে। এক, প্রতি একক জমিতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অর্থাৎ কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা; দুই, প্রতি একক নিউট্রিয়েন্ট ব্যবহারের ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা; এবং তিন, প্রতি একক জল ব্যবহারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে একই সঙ্গে এই তিনটি পথেই চলা সম্ভব হবে।

● এখন প্রচলিত বিশ্বাস হল, জৈব জ্বালানি বা বায়োফুয়েল ব্যবহার করলে তা পরিবেশের পক্ষে লাভজনক। ফলে, গাড়িঘোড়ার জ্বালানি হিসেবে ক্রমেই বিভিন্ন জৈব জ্বালানির (প্রধানত ইথানল, বায়োডিজেল এবং মিথানল) ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত, জৈব জ্বালানি ব্যবহার করলে যে কী লাভ হয়, তা নিয়ে সংশয়ের বিস্তর অবকাশ রয়েছে। বেশ কিছু মাপকাঠিতে দেখা যাচ্ছে, 'জৈব জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে দীর্ঘ মেয়াদে, অর্থাৎ বহু দশক বা শতকের প্রেক্ষিতে, কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ প্রচলিত জ্বালানি ব্যবহারে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় বেশি হবে'।

● জৈব জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ভুট্টা, সয়া বিন এবং আরও বেশ কিছু খাদ্যশস্যের প্রয়োজন পড়ে। এগুলি আবার গবাদি পশুর প্রধান খাদ্যও বটে। ফলে, জৈব জ্বালানির জন্য এই শস্যগুলি ব্যবহৃত হলে পশুখাদ্যে টান পড়ে। তার ফলে পশুখাদ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলেই ২০০৮ সালে উন্নয়নশীল দুনিয়ার বেশ কিছু জায়গায় খাদ্য-দাঙ্গাও হয়েছিল। গ্যাসোলিন উৎপাদন করতে যে পরিমাণ জল প্রয়োজন, জৈব জ্বালানি উৎপাদনের জন্য জলের প্রয়োজন তার বহু গুণ।

● এই কথাটি নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই যে জৈব জ্বালানি ব্যবহারের নতুন নিয়ম এবং সেই জ্বালানির জন্য যে পরিমাণ ভর্তুকি দওয়া হচ্ছে, তাতে খাবার এবং জ্বালানি, উভয়েরই দাম বেড়েছে। ফলে, একটি ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির কাছে তা আরও দুর্লভ হয়ে উঠছে। ভ্রান্ত নীতির ফলে বিশ্বের প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ঢের ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও ক্ষতি হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠটুকুও বুঝতে না পারার জন্য এটা খুবই চড়া দাম যা বিশ্বের সাধারণ মানুষ দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

উ মা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর: ৯৮৩০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৫৩৭।

অসৌজন্য ও অসহিষ্ণুতা

অরূপ চট্টোপাধ্যায় পেশায় চিকিৎসক। থাকেন ইংল্যান্ডে। সম্প্রতি উনি সস্ত্রীক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদার টেরেসাকে নিয়ে এক আলোচনাসভায় যোগ দেন। কিন্তু সেখানে তাঁদের সঙ্গে চরম অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়। অরূপবাবু ও তাঁর স্ত্রী প্রতিবাদে একটি চিঠি দেন উপাচার্যের উদ্দেশে। অরূপবাবু দীর্ঘদিন মাদার টেরেসাকে নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর লেখা বইয়ের পর্যালোচনাও ছাপা হয়েছিল উৎস মানুষ পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণ নিন্দনীয়। প্রতিবাদ হিসাবেই আমরা এখানে সেই দুটি চিঠি অনুবাদ সহ ছাপালাম। **সম্পাদক**

Dr ZELPHA KATHERINE KITTLER MRCPsych
9 Tredegar Square, London E3 SAD email zkittler@yahoo.co.uk
Tel 02089803868 Mob 07943804924 Fax 02089833173
18 August 2011
Dr Suranjan Das
Vice Chancellor, University of Calcutta
Kolkata 70073

Dear Dr Das

On 12 August 2011, my husband and I attended (or tried to attend) a seminar at the Media Studies department at University of Calcutta at its College Street campus. It was an open meeting but we were invited nonetheless (by one of the speakers).

The seminar was titled 'Mother Teresa and the Media' (or similar) and it was billed to be a dicussion and free exchange of ideas during and after the seminar.

My husband Dr Aroup Chatterjee (a calcuttan born and bred and an alumnus of your University) has been researching Mother Teresa over 20 years and holds the views that a) she was a clever manipulator of media and not a fraction charitable that the world thinks she is, and, b) she had done and is doing extraordinary damage to the reputation of Calcutta by portraying it as the squalor capital of the world.

Before the seminar commenced, word went round to the Head of Department of Media Studies Professor Tapati Basu (who I believe was chairing the seminar) that my husband (and possibly I) could make critical comments about Teresa.

I was astounded when we were told by a speaker (before the so-called seminar commenced) that your university had a *rule* that Mother Teresa could not be criticised within its precincts.

When we tried to reason with Prof Bose she became more and more agitated. I tried remininding her India was supposed to be a democracy and there was supposed to be free speech, especially in a university! She became almost incoherent in anger and told us to leave. We found it impossible to reason with her.

Does the University of Calcutta have such rule? I sincerely hope not.

I do not have to remind you the meaning and ethos of the word University. I do sincerely expect you'd investigate the matter. I also hope that such obstruction to the exchange of free thought is an accident and not the norm in your university.

Yours sincerely
Dr Zelpha K Kittler
Copy: Prof Tapati Basu

ডঃ জেলফা কাথরিন কিট্‌লার এম আর সি পি, ৯ ট্রেডগার স্কোয়ার লন্ডন E3 SAD
১৮ আগস্ট ২০১১

ডঃ সুরঞ্জন দাস, উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রিয় ডঃ দাস

গত ১২ আগস্ট ২০১১ আমি ও আমার স্বামী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসে অবস্থিত প্রচারমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ (Media Studies department) আয়োজিত একটি সেমিনারে উপস্থিত ছিলাম (অথবা বলা ভাল, উপস্থিত থাকার চেষ্টা করেছিলাম)। আলোচনা সভাটি ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, যদিও আমরা ছিলাম আমন্ত্রিত (বক্তাদেরই একজন আমাদের আমন্ত্রণ করেছিলেন)।

আলোচনা সভাটির বিষয় ছিল 'মাদার তেরেসা ও প্রচার মাধ্যম' (অথবা এরকমই একটা কিছু)। বলা হয়েছিল সেমিনার চলাকালীন এবং পরেও অবাধ মতবিনিময়ের সুযোগ থাকবে।

আমার স্বামী ডঃ অরূপ চ্যাটার্জী (যিনি কলকাতায় জন্মেছেন, বড় হয়েছেন এবং আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তনী) গত কুড়ি বছর ধরে মাদার তেরেসাকে নিয়ে গবেষণায় রত। তিনি এই মত পোষণ করেন যে: (ক) মাদার তেরেসা প্রচার মাধ্যমকে সুচতুরভাবে নিজের কাজে ব্যবহার করেছিলেন এবং সারা দুনিয়া তাকে যা ভাবে তার কণামাত্র পরোপকারী নন, খ) কলকাতাকে বিশ্বের বুভুক্ষার রাজধানী হিসেবে রূপায়িত করে তিনি এই শহরের অশেষ ক্ষতিসাধন করেছেন।

সেমিনারটি শুরু হবার আগে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা তপতী বসুর (যতদূর জানি তিনিই আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করছিলেন) কানে এ খবর পৌঁছে দেওয়া হয় যে আমার স্বামী (এবং সম্ভবত আমিও) মাদার তেরেসা সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য করতে পারি।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই যখন (আলোচনা শুরু হবার আগে) বক্তাদের একজন আমাদের বলেন যে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম একটি নিয়ম আছে যে এর চৌহদ্দির মধ্যে মাদার তেরেসার সমালোচনা করা নিষেধ।

যতই আমরা অধ্যাপিকা বসুকে বোঝানোর চেষ্টা করি, ততই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করি যে ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ রূপেই পরিচিত এবং সেদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাক্-স্বাধীনতা অবশ্যই থাকা উচিত। তিনি এতে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং আমাদের সভা ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

সত্যিই কি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম কোনো নিয়ম আছে? আমি মনেপ্রাণে আশা করতে চাই যে তা বোধহয় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কথাটির অর্থ ও দ্যোতনা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নিশ্চয়ই কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আন্তরিকভাবে আশা করব যে আপনি ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন। আমার এটা জানতেও ভালো লাগবে যে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত চিন্তা আদান-প্রদানের এরকম বিঘ্ন নেহাতই এক দুর্ঘটনা, প্রথা নয়।

আপনার বিশ্বস্ত

ডঃ জেলফা কে কিট্‌লার

প্রতিলিপি: অধ্যাপিকা তপতী বসু

Dr Aroup Chatterjee
9 Tredegar Square, London E3 SAD
email aroupchatterjee@yahoo.co.uk
Tel 02089803638 Mob 07956363751
Fax 02089833173
20 August 2011

Dr Suranjan Das
Vice Chancellor, University of Calcutta
Kolkata 70073

Dear Dr Das

Further to my wife's letter to you I am writing to express my serious concern about Prof Tapati Basu's behaviour towards us on 12 August. My concern is far deeper than my humiliation, as I seriously question the effect on students of a professor who does not allow basic free speech. It is significant that we did not even have the opportunity to speak at the 'symposium and discussion' - Prof Basu ejected us upon being informed by a speaker that we *might* make critical comments. She informed us that the University had a *rule* that Mother Teresa could not be criticised within its premises. In the area of the city once familiar to Derozio, Vidyasagar and Tagore, I was stopped from expressing basic free speech. It is ironic that I was thrown out from my own university, whereas I have spoken in many others on the same, topic, mainly in officially Catholic and Catholic-majority countries. For instance, in Prague I was interviewed for the state television inside a Catholic church! My embarrasment before my wife was intense as she previously had had a notion of Bengal a high-minded and open society. Interestingly I spoke in Trinity College Dublin (my wife's alma mater) for their annual Philosophical Society meeting, when I touched upon the noble intellectual traditions of Calcutta. In the wider world Calcutta is synonymised with intense squalor and degradation where only Mother Teresa's order brings any kind of succour, hence my effort has been over the last two decades to portray the true picture. I have no issues with her religion and her conversion motive does not bother me.

If I had been given a chance to speak, I might not have even spoken about Mother Teresa. The seminar showed the film on Teresa, *Something Beautiful for God*, made by Malcolm Muggeridge. I was hoping to tell the students a few facts about Muggeridge - about his white supremacist attitude and his anti-Semitism, his sexual hypocrisy (while he was preaching against contraception and sexual freedom, he himself was undertaking numerous affairs) etc. Incidentally the film shows Calcutta in a pretty negative light, but there's nothing new in that. Clips from the film were shown in the Woody Allen film *Alice*, where William Hurt makes the famous (or notorious)statement, 'There are 10000 unknown diseases in Calcutta.'

I do hope you will look into this matter as such behaviour by one of your professors is deeply disturbing.

Yours sincerely

Aroup Chatterjee

Copy: Prof Tapati Basu

ডঃ অরূপ চ্যাটার্জী
৯ ট্রেডেগার স্কোয়ার, লন্ডন

ডঃ সুরঞ্জন দাস
উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০ আগস্ট ২০১১

প্রিয় ডঃ দাস,

আপনাকে লেখা আমার স্ত্রীর চিঠির সূত্র ধরেই গত ১২ আগস্ট ২০১১ আমাদের প্রতি অধ্যাপিকা তপতী বসুর আচরণ সম্পর্কে আমার গভীর উদ্বেগ জ্ঞাতার্থে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আমার লাঞ্ছনার থেকে বেশি গভীর আমার এই উদ্বেগ। ন্যূনতম বাক্-স্বাধীনতা প্রকাশের বিরোধী এক অধ্যাপিকার এহেন আচরণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, আমার শঙ্কা তা নিয়েই। এটা উল্লেখনীয় যে ওই 'বিতর্ক ও আলোচনা' সভায় আমাদের বক্তব্য রাখার কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি—আমরা বিরূপ মন্তব্য করতে পারি, বক্তাদের একজনের কাছে এমন সংবাদ শুনে অধ্যাপিকা বসু আমাদের তাড়িয়ে দেন। তিনি আমাদের এও জানান যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি এমন একটি নিয়ম আছে যে এর চার দেওয়ালের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাদার তেরেসার সমালোচনা করা চলে না। কলকাতা নগরীর এমন এক অঞ্চলে আমাকে আমার স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দেওয়া হল, যা একদা ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর আর রবীন্দ্রনাথের পদচারণায় ধন্য হয়েছিল।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আমাকে আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। অথচ একই বিষয়ে আমি বহু দেশে, বিশেষত ক্যাথলিক ও ক্যাথলিক-গরিষ্ঠ দেশগুলিতে অগণিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তব্য রেখেছি। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, প্রাগে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের জন্য আমার একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় একটি ক্যাথলিক গীর্জায়! আমার স্ত্রীর সামনে এই ঘটনাপ্রসূত বিড়ম্বনা ছিল আরো বেদনাদায়ক, কারণ এর আগে পর্যন্ত বাংলাকে তিনি জানতেন এক উচ্চ-মননশীল ও উদার সমাজ হিসেবে। মজার ব্যাপার হল, ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের (আমার স্ত্রীর শিক্ষাপীঠ) ফিলসফিক্যাল সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলকাতার মহান মননশীল ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করেছিলাম। বহির্বিশ্বে কলকাতাকে ভয়ঙ্কর বুভুক্ষা ও অবক্ষয়ের নগরী রূপে, সেখানে মাদার তেরেসার প্রতিষ্ঠানই যা কিছু স্বাচ্ছন্দ প্রদান করতে সক্ষম। এই কারণেই গত দু'দশক ধরে আমি কলকাতার প্রকৃত চিত্রটি সবার সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তার ধর্ম ও বিশ্বাস নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই, তার ধর্মান্তকরণ করার উদ্দেশ্য নিয়েও আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

আমাকে যদি বলার সুযোগ দেওয়া হত, আমি হয়তো মাদার তেরেসা সম্পর্কে কিছুই বলতাম না। সেমিনারটিতে মাদার তেরেসাকে নিয়ে ম্যালকম মাগেরিজ নির্মিত চলচ্চিত্র '*Something Beautiful for God* ' দেখানো হয়। আমি ভেবেছিলাম মাগেরিজ সম্পর্কে ছাত্রদের কিছু তথ্য জানাতে পারব। আমি জানাতে চেয়েছিলাম তার সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব ও ইহুদি বিদ্বেষের কথা, চেয়েছিলাম যৌনতা নিয়ে তার দ্বিচারিতা ফাঁস করতে (মুখে জন্মনিয়ন্ত্রণ আর যৌন স্বাধীনতা বিরোধী কথা বললেও তার একাধিক যৌন সম্পর্ক রয়েছে)। প্রসঙ্গত, ছবিটিতে কলকাতাকে যথেষ্ট নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখানো হয়েছে। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। উডি অ্যালেনের ছবি 'Alice'-এ এই ছবিটি থেকে কিছু অংশ দেখানো হয়েছে, যেখানে রয়েছে উইলিয়াম হার্টের সেই বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) উক্তি: 'কলকাতায় রয়েছে দশ হাজার অজানা ব্যাধি।'

আমি আশা করব আপনি নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করবেন, কারণ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপিকার এহেন আচরণ যথেষ্ট পীড়াদায়ক।

আপনার বিশ্বস্ত
অরূপ চ্যাটার্জী

প্রতিলিপি: অধ্যাপিকা তপতী বসু।

অনুবাদ: পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার নয় প্রয়োজন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের

সন্দীপ সিংহ

বিগত ৩৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকা এবং একটিমাত্র বামপন্থী ফ্রন্ট দ্বারা সরকার পরিচালনার ঘটনা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন যুগান্তকারী ঘটনা আবার এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার ইতিহাসে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পড়ুয়াদের গিনিপিগ করে তোলার ঘটনাও কিন্তু সমান ভাবে যুগান্তকারী। বর্তমানে ক্ষমতা বদলের পরেও শিক্ষাব্যবস্থায় শুরু হয়েছে নতুন করে কাটাছেঁড়া। আবার একটি প্রজন্মকে পরিবর্তনের মূল্য দিতে হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা হচ্ছে সেগুলি হল পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থা বা মূল্যায়ন, শিক্ষার গুণগত মান, বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ধরে রাখার জন্য নানা ব্যবস্থা, মিড-ডে-মিল ইত্যাদি। বহু শিক্ষাবিদ, সামাজিক সংস্থা ও সরকারিভাবে এই বিষয়ে নানাধরনের সমীক্ষার তথ্য প্রকাশ করে সাফল্য বা ব্যর্থতাকে তুলে ধরেন। বিশেষত, সরকারি সমীক্ষার তথ্য দেখে বহুক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়। শিক্ষক হিসাবে বাস্তবক্ষেত্রে হাতে কলমে কাজ করার বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক সময় সমীক্ষার তথ্যকে মেলাতে পারি না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের এই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করি। এখানেও সেই প্রয়াস উৎস মানুষের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বশিক্ষা মিশনের তাগিদে আমাদের রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। শিক্ষায় সংখ্যাগত মান বৃদ্ধি যেমন হয়েছে তেমনি গুণগত মানের অবনমন ঘটেছে। নব্বই নম্বরের পরীক্ষায় শূন্য পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের গোড়ায় গলদ। চতুর্থ শ্রেণীর গণ্ডি পেরিয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য যারা আসে তাদের মধ্যে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনুসারে, প্রায় ২৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিজের নাম ও বাবার নাম ছাড়া আর কিছুই শিখে আসে না। গত শিক্ষাবর্ষে আমাদের বিদ্যালয়ে নতুন ১৬৯ জন ছাত্রছাত্রীকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির পর অতি সাধারণ মানের ৩০ নম্বরের, যার মধ্যে বাংলা ১০, ইংরাজি ১০ ও গণিত ১০-এ পরীক্ষা নিয়েছিলাম। দেখা গেল ৪১ জন শূন্য পেল আর ১ থেকে ৬ পর্যন্ত নম্বর পেয়েছিল ৭০ জন। শূন্য পাওয়াদের মধ্যে ৭৭শতাংশ ছিল তফসিলি জাতি-উপজাতি ও মুসলিম শ্রেণীভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী। প্রত্যেক বছরেই কমবেশি এমনই অভিজ্ঞতা হয় আমাদের। স্বাভাবিক ভাবেই একেবারে শূন্য স্তরে থাকা পড়ুয়াদের নিয়ে যখন পঞ্চমশ্রেণীর জ্ঞানগর্ভ সিলেবাস পড়ানো হয় তখন তারা অন্ধকারেই থাকে। এরা পেছনের বেঞ্চে বসে হয় গোলমাল করে নয়ত ভয়ে বাক্‌শক্তি হারিয়ে সময় কাটায় জেলখানার কয়েদির মতো। দিনের পর দিন পড়া না করতে পারার জন্য কোন শিক্ষকের বকা খেতে হয় অথবা দৈহিক শাস্তিও ভোগ করতে হয়। বাড়িতে বাবা-মায়ের তিরস্কার, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের তিরস্কার আর প্রতিনিয়ত 'তুই বোকা', মাথা মোটা', 'গাধা', 'তোর দ্বারা কিছুই হবে না' প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দ তার মস্তিষ্কের মধ্যে তরঙ্গায়িত হয়ে তাকে হতাশার অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। সারা বছর এই হতাশার মধ্যেই কৈশোর কাটে। এইভাবে বিদ্যালয়ের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ও বিকর্ষণ জন্মাতে থাকে। খুব অভাবের পরিবার হলে বিদ্যালযে দুপুরের খাবার খাওয়ার একটা তাগিদ থাকে। পেটের চাহিদা মেটানোর জন্যই সমস্ত হতাশা, বিকর্ষণ, ভয়-ভীতি, লজ্জা সত্ত্বেও বাবা-মায়ের চাপে বিদ্যালয়ে বাধ্য হয়ে সময় কাটাতে হয়। আর যাদের পরিবারে এই অভাব নেই তার ক্ষেত্রে পেটের চাহিদা পূরণের তাগিদও নেই। ফলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দিলে হয়তো আরো কিছুদিন বিদ্যালয়ে থাকা, না হলে এখান থেকেই শুরু স্কুলছুট। অন্যদিকে আমাদের সরকার ও তার বাঁধাধরা শিক্ষাবিদরা কত পরিকল্পনা করছেন স্কুলছুট কমানোর বা বন্ধ করার জন্য। এক্ষেত্রে শেষ দাওয়াই নাকি বিলাতের পণ্ডিতদের দেওয়া, তা হল মিড-ডে মিল। এটা হলেই নাকি স্কুলছুট বন্ধ হবে। বিদ্যালয়ে মনের চাহিদা না মিটলেও হবে, সে খবর পরে রাখা যাবে। আগে পেটের চাহিদা মেটাতে হবে। ছেলে ভোলানোর এর থেকে ভালো দাওয়াই আর কী আছে! মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষক ছাত্র অনুপাত এখন ১:৮০। একটি শ্রেণীকক্ষে ৮০ থেকে ১০০ জন পড়ুয়াকে পঠন-পাঠনের জন্য রাখতে হয় উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক না থাকার জন্য। বেশির ভাগ

বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই, মাঠ থাকলেও সরঞ্জাম নেই, শিক্ষক নেই। বালা প্রকল্পে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করে দেওয়ালে কিছু ছবি আঁকলেই নাকি পড়ুয়াদের আকর্ষণ বাড়বে! পঞ্চম শ্রেণীতে আসা এই সব মানের পড়ুয়াদের যখন ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, দেশ দখলের লড়াই, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রভৃতি পড়ানো হয় স্বাভাবিকভাবেই পড়ুয়াদের উপর কী ভীষণ মানসিক চাপ বাড়ে তা বোঝার চেষ্টা কেউ করেছেন কি? তাই মিড-ডে মিলের দাওয়াই দিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলিকে লঙ্গরখানা বানানোর এ এক গভীর ভাবনার ফসল। শিক্ষার পরিবেশ যখন বিদ্যালয়গুলিতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করার ক্ষমতা ও সাধ কোনটাই নেই সরকারের তখন সস্তায় জনপ্রিয়তা নেওয়ার এ এক মহাচমক ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠাকুরের মন্দিরে যখন একই সঙ্গে ধুম করে পূজা হয় আর অন্যদিকে মহানন্দে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয় তখন দেখা যায় পূজো দেখার চেয়ে খাওয়ার স্থানে ভিড় বেশি। পুরোহিত কীভাবে পূজো করছেন সেইদিকে মনটা খুব একটা থাকে না ব্যতিক্রমী চরিত্র ছাড়া। বিদ্যালয়েও সকাল থেকে খাওয়ানোর জন্য রান্নার প্রস্তুতি, সেখানে শিক্ষকরাও ব্যস্ত। শিশুমন আনচান করে কখন খাওয়ার ঘণ্টা পড়বে। রান্নার গন্ধ আসার পর থেকেই যেন শিশুমন ক্লাস থেকে উধাও হয়ে যায়। তার পর হৈ-হুল্লোড় করে খাওয়ার পর কে-বা চায় আবার পড়তে। এইভাবেই মিড-ডে মিল দাওয়াই-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গোটা বিদ্যালয়কে দূষিত করছে। বিদ্যালয় এবার হয়ে উঠছে খাদ্যালয়। বিদ্যা এখানে লয় প্রাপ্ত। লঙ্গরখানায় যা হয় তাই হচ্ছে। পড়ুয়াদের দোষ দিয়ে নিজেদের হীনতা ও দুর্বলতাকে নানাভাবে ঢাকতে সদা ব্যস্ত সব মহল।

স্কুলছুট বন্ধ করার জন্য সর্বশিক্ষা মিশন যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে, তৃণমূলস্তরের খবর না নিয়ে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার নীতি নিয়ে ব্যর্থ হতে চলেছে। সর্বশিক্ষা মিশনের টাকায় বহু শ্রেণীকক্ষ নির্মিত হয়েছে, শৌচাগার হয়েছে, কিছু সরঞ্জাম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যাদের জন্য এই মিশন সেই পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জীবনের হতাশার অন্ধকার দূর হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের ক্ষতি করে নানা মোড়কে পুরানো গতানুগতিক শিখন পদ্ধতিকে আলোচনার জন্য রাজ্যস্তর থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত হাজার হাজার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে একই ভাবে প্রশিক্ষণের মোড়কে শুধু খাওয়াদাওয়া আর বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের ক্ষতি ছাড়া কোন কাজের কাজ হচ্ছে না। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতামত নিয়ে দেখি ৯৮ শতাংশ বলেন এর কোনও মূল্য নেই। নতুন বোতলে পুরানো মদ ঢালার মতই ব্যবস্থা চলছে সারা রাজ্যে। আমাদের পঠন-পাঠন পদ্ধতির মধ্যে পড়ুয়াদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখানোর বা তাদের সৃজনশীল করে তোলার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই, সেই পরিকল্পনাও নেই। এই ব্যবস্থায় তোতাপাখি তৈরি করা হচ্ছে। একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রতি কোনও আস্থা নেই অভিভাবদের। শিশুশ্রেণী থেকেই প্রাইভেট টিউশন দেওয়া হচ্ছে প্রায় ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে আর চতুর্থ শ্রেণীতে প্রায় ৯৮ শতাংশ। বিষয়কে বোঝা, আয়ত্ত করা তাকে অনুশীলন করা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তোলা—এইসবের মধ্যে না থেকে কেবল চোখ বুজে মুখস্ত করা আর বেশি নম্বর পাওয়ানো এটাই এখন লক্ষ্য। এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে একজন ক্ষেতমজুর পর্যন্ত বহুকষ্ট করেও তার সন্তানের 'পিছনে দুটো মাস্টার' দিতে বাধ্য হচ্ছেন। বিদ্যালয়ে ক্লাসের মধ্যে বিষয়কে সম্যক বুঝে নেওয়ার সুযোগ নেই পড়ুয়াদের। পাঠ্যক্রমের পিছনে তাদের ছুটতে হচ্ছে। বিষয়বস্তুকে বোঝার উপযুক্ত সময় নেই কারণ সামনেই একক অভীক্ষা অথবা ষান্মাসিক বা বার্ষিক পরীক্ষা। পড়ুয়াদের বিষয়কে অনুধাবন করার কোনো স্বাধীনতাই নেই। শেখা হোক বা না হোক শিক্ষক মশায়ের দায় আছে নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করা। এটা করতে করতে অন্যদিকে বেশিরভাগ পড়ুয়াকেই যে শেষ করা হচ্ছে তার মূল্যায়ন তো হয় না! সুতরাং এই পড়ুয়া শেষ করা শিক্ষন ব্যবস্থা-র কোনো পরিবর্তনের কথা না ভেবে কেবল ভাবা হচ্ছে কীভাবে তাকে বিদ্যালয়ে দৈহিকভাবে উপস্থিত রাখা যায়। তার মনকে গড়ার জন্য একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন শিক্ষা ব্যবস্থায় না আনতে পারলে কেবল পড়ুয়াদের গিনিপিগ করা হবে। উৎসমুখকে বন্ধ না করে স্রোতের গতিকে বালির বাঁধ দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টাই চলছে। প্রাইভেট টিউশন যাতে নিতে না হয় সেরকম উপযোগী পাঠ্যক্রম, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তন এসব না করে সার্কুলার দিয়ে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন করতে নিষেধ করে সুফল পাওয়া যায় না তা প্রমাণিত। ১৪ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের যদি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেই হয় তাহলে সাহস নিয়ে তোতাপাখি বানানোর এই শিক্ষা কাঠামোকে ভেঙে নতুন আঙ্গিকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা করতেই হবে, অন্যথায় শিক্ষা ব্যবস্থায় এই অস্থিরতাই চলতে থাকবে।

স্কুলছুটের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কারণগুলি উপেক্ষা করা যাবে না। প্রথমত গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর, বর্গাদার, ছোট চাষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক পরিবারগুলির আর্থিক সঙ্কটের প্রভাবে সন্তানদের পড়াশোনার উপর কোপ পড়ে। যদিও এখন বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারগুলি নানা রকম সুযোগ পায়। এছাড়া বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্যও খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না। তথাপি দেখা যায় প্রাইভেট টিউশনের পরিবেশের মধ্যে দরিদ্র অভিভাবকেরাও ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশনের টাকা জোগাড় করতে নাস্তানাবুদ হয়ে যান। বিদ্যালয়গুলি সরকার নির্ধারিত বছরে সামান্য ফি নিলে যখন বিভিন্ন অভিযোগে বাজার

সরগরম হয়, কমিশনের টাকা ফেরৎ দিতে হয়, তখন প্রাইভেট টিউশনের জন্য বহু টাকার ধাক্কা সামলানোর দায় কে নেবে? কেউ প্রশ্ন করতে পারেন প্রাইভেট টিউশন নিতে হবে কেন? নিতে বাধ্য, কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সুতরাং গরিবের ওপর আর্থিক দায় থেকেই যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, কৃষিজাত পণ্যের দাম চাষিরা পাচ্ছেন না, চাষের জন্য খরচ বেড়েছে প্রচুর। কৃষক পরিবারগুলি চরম আর্থিক সঙ্কট ও দুর্দশার মধ্যে দিন কাটান। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিবারগুলির সন্তানদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ১২-১৩ বছর বয়সের ছেলেদের জুয়েলারি কাজ বা অন্যান্য নানা শিল্পকাজে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা থেকে হাজার হাজার কিশোর কাজের সন্ধানে মুম্বাই, সুরাট, দিল্লি প্রভৃতি শহরে চলে যাচ্ছে। অভিভাবকেরা প্রায়ই আসেন শংসাপত্রে ছেলের বয়স একটু বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে। কারণ অন্য রাজ্যে মাঝে মাঝে পুলিশের হানা আছে শিশুশ্রমিক বন্ধ করার জন্য, আমাদের রাজ্যে সেটিও নেই। তৃতীয়ত, নাবালিকাদের বিবাহ দেওয়ার প্রবণতা এখনো প্রবল, বিশেষ করে—সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতা হল বছরে গড়ে ১০ শতাংশ মেয়ে স্কুলছুট হচ্ছে বিয়ের জন্যই। সরকার, পঞ্চায়েত, মহিলা কমিশন কেউ এসব দেখে না। চতুর্থত, গ্রামাঞ্চলে আর একটি বিষয় পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীর মানুষের সন্তানদের পড়াশোনার পরিবেশকে নষ্ট করে তা হল অবাধ ও ব্যাপক চোলাই মদের ব্যবসা। খেটে খাওয়া পরিবারের পুরুষটি সন্ধ্যার পর আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে ফিরে স্ত্রী ও পরিজনদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। দিনের পর দিন বহু সংসারে এভাবে শিশুদের পড়াশোনার কোনো পরিবেশ থাকে না। শিশু-কিশোরের মনটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়, যার প্রতিক্রিয়ায় পড়াশোনার ওপর কোপ পড়ে। এসব বিষয়গুলি স্কুলছুটের অন্যতম কারণ বলে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখি। বিশেষজ্ঞ মহল এ নিয়ে চিন্তা করবেন কিনা জানি না। পঞ্চমত, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত করে দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর পর সুযোগ দিতে হবে। পেশাগত দক্ষতা ও স্বনির্ভরতার পথে তাদের যুক্ত করতে না পারলে 'লেখাপড়া শিখে কী লাভ' জাতীয় মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। শুধু মিড-ডে-মিল দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। বিদ্যালয়ের মধ্যে হাজারটা সমস্যার সঙ্গে দুপুরের রান্নার দায়িত্ব না চাপিয়ে বিকল্প পথে এর ব্যবস্থা করা দরকার। স্থানীয় পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং এন জি ও-গুলিকে এই দায়িত্ব দিয়ে সুষ্ঠুভাবে এই কাজ করা যেতেই পারে। পঠন-পাঠনের চিন্তাভাবনার জন্যই শিক্ষকদের যুক্ত রাখা হোক। শিক্ষা ক্ষেত্রগুলিকেও এর দায় থেকে মুক্তি দিলে শিক্ষার ভাল হবে। সর্বোপরি স্কুলছুট বন্ধ করার জন্য ভিতকে মজবুত করতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের আরো বেশি দক্ষ ও যোগ্য করে নেওয়ার সতর্ক পদক্ষেপ দরকার। এই স্তরে কারো ফাঁকির জন্য পড়ুয়াদের জীবন যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তা চলতে দিলে হবে না। নিজেদের ফাঁকির দায় পড়ুয়া ও তার পরিবারের কাঁধে চাপিয়ে মাসের শেষে বেতন নিয়ে সুখবিলাসে মেতে গেলে চলবে না। অনেক অনেক বেশি দায়বদ্ধ, দক্ষ, যোগ্য হতে হবে মানুষ গড়ার আচার্যদের। আত্মসমালোচনাকে বাদ দিয়ে নয়, কোন রকম অহংকার বা ইগোর প্রাধান্য নয়, সমাজকে ক্ষয়িষ্ণুতার হাত থেকে বাঁচানোর এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার প্রধান দায় আমাদের শিক্ষক সমাজের। বহু যোগ্য, দক্ষ শিক্ষক এ কাজে নিয়ত যুক্ত আছেন কিন্তু এখনো বহু ফাঁক ও ফাঁকি থেকে গেছে। সবসময় সরকারি আইন বা নির্দেশ দিয়ে এই ফাঁক পূরণ করা যাবে না। সমস্ত মাল-মশলা থাকা সত্ত্বেও রাঁধুনির অকর্মণ্যতায় রান্না খারাপ হয়ে যেতেও পারে। অনেক কিছু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আছে আবার অনেক কিছুর অভাবও আছে। এসব সত্ত্বেও যদি আচার্যকুল মর্যাদার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এই নেই-এর রাজ্যেও অনেক কিছু করা সম্ভব। পড়ুয়াদের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটাতে না পারলে সমাজ বাঁচবে না। ভালো ডাক্তার, ভালো ইঞ্জিনিয়ার, ভালো রাজনীতিবিদ তৈরি হচ্ছে ও হবে কিন্তু ভালো মানুষ তৈরি করার সব রকম প্রচেষ্টা না থাকলে গোড়ায় বলদ থেকেই যাবে। এই কাজটিই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। প্রতিনিয়ত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটাতে হবে আমাদের সকলের মধ্যেই। বারবার নিয়ম-নীতির সংস্কার করে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত না করে দরকার একটা আমূল পরিবর্তন। সেখানে হয়তো সাময়িক গেলো গেলো রব উঠবে কিন্তু পড়ুয়ারা বাঁচবে। আমাদের রাজ্যে 'বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন ২০০৯-কে কার্যকরী না করে তার দু-একটি বিষয়কে নিয়ে অযথা বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধের হস্তিদর্শন না করে সমগ্র আইনটিকে সরকার দায়িত্ব নিয়ে কার্যকরী করলে বিদ্যালয় শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হয়। সরকার তার আর্থিক দায় সামলাতে পারবে কিনা সেটাই দেখার। **উ মা**

চাই স্বাস্থ্য চাই প্রাণ
শ্রমজীবী হাসপাতাল
(মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল)
গ্রাম-বড়বেলু, পো: বেলুমিল্কী, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি
আগামী ২৬শে জানুয়ারি, ২০১২ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায়
শুভ উদ্বোধন
এবং সকাল ৮টায় বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল থেকে শ্রীরামপুরে
শ্রমজীবী হাসপাতাল পর্যন্ত সাইকেল মিছিল।
আপনিও আমন্ত্রিত

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন
রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র এবং নীলরতন

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

২০১০-১১ সাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং নীলরতন সরকারের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী। পোস্টার-হোর্ডিং-বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ যেমন ছয়লাপ, অন্য দুজন তাঁর একাংশও অধিকার করতে পারেন নি। এই একপেশে সম্মান প্রদর্শনের প্রচেষ্টা যে আসলে রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করা সেটুকু বোঝার ক্ষমতাও আমাদের নেই। অথচ তিনজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রথিতযশা, এ কথা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই তিনজনকে এক গভীর সখ্যতায় বেঁধেছিল, এই লেখায় আমরা সেই যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করব। দেশ তখন ইংরেজের অধীন। তিনজনই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তা সে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদই হোক। আমরা এখানে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে আঙ্গিকে এই তিনজনের কাজ এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সেই কর্মকাণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করব।

ঔপনিবেশিক ভারত ইতিহাসের এক দিক নির্দেশক ঘটনা—বঙ্গভঙ্গ (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫)। ১৯০৩ সাল থেকেই সরকার বাংলার সীমানা-পুনর্বিন্যাস করতে চাইছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪ সালে কার্জন ব্রডরিককে লেখেন, "বাঙালীরা যারা নিজেদের একটি জাতি হিসাবে ভাবতে পছন্দ করে এবং ইংরেজরা বিতাড়িত হবার পর ভবিষ্যতে একজন বাঙালীবাবুর কলকাতার সরকারি ভবনে অধিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখে, তারা স্বপ্ন পূরণের পথ বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনায় তীব্রভাবে তাদের রাগ-দ্বেষ উগরে দেবে। আমরা যদি দুর্বলতাবশত তাদের চাওয়াকে প্রতিহত না করতে পারি তাহলে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ বা সংকোচন আর কখনো করতে পারব না। ফলে পূর্বপ্রান্তে যে শক্তি এখনই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে যা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গোলযোগের উৎস হয়ে উঠবে।"[১] বঙ্গভঙ্গের যদি উদ্দেশ্য হত প্রশাসনিক সুবিধা, তাহলে হিন্দি ও ওড়িয়া-ভাষী অঞ্চলকে যোগ করা যেতে পারত। কিন্তু তা না করে পূর্ববাংলার ও আসামের কিছু জেলা বিচ্ছিন্ন করে এক নতুন রাজ্য গঠন করার কথা ভাবা হল, হিন্দি ও ওড়িয়া-ভাষী অঞ্চলকে এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে আগের মতোই বাংলার সাথে যুক্ত করে রাখা হল। এর ফলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হল: (১) দুই রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত বিভেদ তৈরি করা; (২) পূর্ববঙ্গ যেহেতু মুসলিম প্রধান অঞ্চল, কাজেই মুসলিমদের অবিভক্ত বাংলায় হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করা এবং হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বপন করা। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করাই ছিল বঙ্গভঙ্গ-র অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাঙালি কিন্তু মাথা পেতে নেয় নি এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে। ১৯০৩ সালের বঙ্গভঙ্গের সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পর থেকে রাজনৈতিক, আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ কেন্দ্রগুলো থেকে প্রতিবাদ আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল। অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও স্টার থিয়েটারে রমেশচন্দ্র দত্ত-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অধিবেশনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ক্ষতির আশঙ্কা করে প্রস্তাবটির বিরোধিতা করা হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গিরিডি থেকে দেওঘর যেতে হয়। এ অবস্থায়ও তিনি বেশ কিছু দেশাত্মবোধক গান যেমন 'ও আমার দেশের মাটি', 'আমাদের যাত্রা হল শুরু', 'ওদের বাঁধন যত শক্ত করে' রচনা করেন। তাঁর এই দেশাত্মবোধক গানগুলো সারা বাংলাকেই মাতিয়ে তুলেছিল। ৯ অক্টোবর বাগবাজারের রায় পশুপতি বসু বাটিতে যে বিজয়া সম্মিলনী হয় রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এবং এখানে তিনি বলেন, 'আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে—আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সম্মিলনে আমাদের তৃপ্ত করিতেছে না—আনন্দের দিনে সমস্ত দেশের জন্য আমাদের গৃহদ্বার আজ অর্গলমুক্ত হইয়াছে।'[২] ১২ অক্টোবর ময়মনসিংহের মহারাজার বাড়িতে তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় জাতীয় ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ঠিক হয়, এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থ তোলা হবে ১৬ অক্টোবর এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় মিটিং অনুষ্ঠিত হবে পশুপতিনাথ বসুর বাটীতে ঐদিন বিকেলবেলা। সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হবে অন্তত একদিনের বেতন দান করতে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আইন অনুযায়ী বাংলা ভাগ হবার পর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে থাকে। ঐ দিন কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হল। এছাড়াও শুরু হয় অরন্ধন, নগ্নপদে পথ পরিক্রমার পর গঙ্গাস্নান ও রাখিবন্ধন। অরন্ধন করে শোকপ্রকাশ, গঙ্গাস্নান করে শুচিতালাভ এবং রাখিবন্ধনের মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব

বন্ধনের স্বীকৃতি। পুরোটাই রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কজাত। ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ লেখেন, 'সেদিন রবিকাকাকে সামনে রেখে দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদনে শোক পালন করতে জোড়াসাঁকো থেকে নগ্নপদে সবাই হেঁটে গেলেন পবিত্র গঙ্গার ঘাটে। তারপর পূণ্যসলিলা জাহ্নবীতে অবগাহন করে পূত পবিত্র হয়ে সবাই ঘরে ফিরলেন, পথে যাকে পেলেন তারই মনিবন্ধে রাখি বেঁধে দিলেন ব্রাতৃত্ববন্ধনের নিদর্শন হিসাবে।'[৩] ঐ দিনই বিকেলবেলা 'ফেডারেশন হল'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ বিশাল জনতা সভার শেষে পদব্রজে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে উপস্থিত হন। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ভাণ্ডারে একশ' টাকা দান করেন।[৪] বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের একটা পর্যায়ে বিলিতি ভোগ্যপণ্য বয়কট, স্বদেশী শিল্পের গঠন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ তৈরি এবং সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন—এগুলোকে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসাবে ধরা যেতে পারে। বয়কটকে তিনি দেখেছেন বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে, দেশকে ভালবেসে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে, দেশীয় কৃষ্টিকে পুনর্জীবনের মাধ্যমে। এ সময়ে তিনি 'বঙ্গবিভাগ' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন।[৫] সেখানে তিনি এক জায়গায় লেখেন, "...যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না—বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহ প্রত্যাবর্তনের জন্য গোধুলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিনসাল কনফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া নিজদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না।"

প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিদেশ থেকে রসায়নে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারি অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। যদিও এই সহকারি অধ্যাপক পদে যোগদান খুব সহজে হয় নি। ক্রাম ব্রাউনের সুপারিশপত্র, স্যার উইলিয়াম মূয়রের লেখা ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য চার্লস বার্নার্ডের কাছে পরিচয়পত্র, বার্নার্ডের সুপারিশে কলকাতা প্রেসিডেন্সির অধ্যক্ষ সি এইচ টনির বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড ক্রফটের কাছে প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচিতিপত্রের পরেও ১৮৮৮-র অগাস্ট থেকে ১৮৮৯-র জুন অব্দি তাঁকে কর্মহীন হয়েই কাটাতে হয়।[৬] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অতিশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত ভারতীয়দের এক মাপকাঠিতেই বিচার করত। সারা ভারতে ওই সময় ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে তিনজন মাত্র ভারতীয় ছিলেন। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, ডি এস সি, এফ আর এস; ডঃ ডি এন মল্লিক, ডি এস সি, এবং একজন খ্রিস্টান ভদ্রলোক যিনি মাদ্রাজে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। স্যার পি সি রায়কে প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকাকালীন মইয়ের নিচু ধাপেই থাকতে হয়েছিল।[৭] (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের অবগতি (!) সম্পর্কে নানা বিদ্যোৎসাহী জনের মূল্যায়ন পড়ে এবং বিভিন্ন জনের কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন দেখে অবাক হতে হয়। অধ্যাপক বিকাশ সিংহ, আনন্দবাজার পত্রিকা ৩ জানুয়ারি ২০১২ সংখ্যায়, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছেন। বিষয়টি প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। "...এই বাংলাতেই অতীতের নাম করা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিশ্বমানের করব বলে আমরা মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। কোন মানই নেই যেখানে, সেখানে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একেবারে বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়া না রাতারাতি।...ধীরে ধীরে পরিবর্তনের ধারাকে নিয়ে আসতে হবে, তার জন্য দরকার গভীর অধ্যাবসায় এবং অসীম ধৈর্য। মূল ব্যাপার...মানসিকতা, সামাজিক কাঠামো, বিশেষত দৃষ্টিভঙ্গির আপাদমস্তক পরিবর্তনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ...আজকের গরিব দুঃস্থ ভারতীয় ছেলেমেয়েরাই তো আগামী কালের ভারতকে গড়বে। সেই আগামী দিনের কারিগরদের কথা ভাবুন। প্রাথমিক শিক্ষার দিকে মন দিন, ছোট ছোট ছড়িয়ে থাকা বিদ্যালয়গুলির উন্নতি করুন।... এই শিক্ষা যদি উন্নত না হয়, শিক্ষার আসল কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।" পুরনো তো বোধহয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একটা কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে না হলেও পরে তৈরি, যেখানে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এবং স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে ইম্পিরিয়াল সার্ভিস না পেয়ে জুনিয়ার অধ্যাপক হিসাবেই কাটাতে হয়েছিল; বর্তমানে স্বাতন্ত্র এক বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজের উচ্চস্তরের একদল মানুষের ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরেজদের কাছে থাকার সূত্রে সাধারণের চাইতে হয়তো সেই সময় কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। বরঞ্চ পাশাপাশি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে সাধারণ আয়ের ঘরের উজ্জ্বল ছাত্র আসতেন। ভাল শিক্ষক সব কলেজেই ছিলেন এবং এখনো আছেন। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের উন্নতি যদি করতেই হয় তাহলে পাশাপাশি সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। নইলে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়: 'পশ্চাতে রাখিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।') ১৮৯১ সাল নাগাদ তিনি, নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র—এই রকম কয়েক বন্ধু মিলে পরিবেশ সচেতনতার উদ্যোগ এবং প্রসারের উদ্দেশ্যে 'নেচার ক্লাব' শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের গবেষণাগার তখন খুব অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ছিল। ১৮৯২ সালে পেডলারের অনুকূল্যে স্যার পি সি রায় এবং চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ির তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রথম আধুনিক রসায়ন গবেষণাগার সৃজিত হল। ১৮৯৪ সালে খাদ্যদ্রব্যে বিশেষত তেল ও ঘিয়ে ভেজালের ব্যাপারে তাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকাকালীন প্রথম গবেষণাপত্র এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এরপরে ১৮৯৬ সালে ঐ জার্নালেই তাঁর 'মার্কিউরাস নাইট্রাইট' সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়।[৮] এই গবেষণাপত্র বেরোবার পরে 'নেচার' লেখে: "বাংলার এশিয়াটিক

সোসাইটির জার্নাল আমাদের রসায়নের জার্নালের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এটির বর্তমান সংখ্যায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ডঃ পি সি রে-র মার্কিউরাস নাইট্রাইট সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে, যেটি উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। মার্কিউরাস নাইট্রেট তৈরির সময়, ঠাণ্ডা, পাতলা নাইট্রিক অ্যাসিড পারদের ওপর পড়লে যে হলুদ রঙের কেলাস গঠিত হয়, পরীক্ষা করে দেখা গেছে তা মার্কিউরাস নাইট্রাইট।"[৯] (বর্তমানে বিক্রিয়াজাত যৌগটি মার্কিউরাস নাইট্রাইট না মার্কিউরাস নাইট্রেট—এই নিয়ে এক অদ্ভুত তর্ক উঠেছে। সময়ের কষ্টিপাথরে এবং গবেষণাগারে এটা পরীক্ষিত যে বস্তুটি মার্কিউরাস নাইট্রাইট। শুধু মার্কিউরাস নাইট্রাইট নয়, আরো কয়েকটা নাইট্রাইট আবিষ্কার করার জন্য স্যার পি সি রায়কে 'মাস্টার অব নাইট্রাইটস' বলতেন সাহেবরা। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১)-র একটা খবরের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই খবর অনুযায়ী, লন্ডনের রয়েল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রি আচার্য রায়কে 'কেমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক প্লাক' দিয়ে সম্মান জানাবেন—যেটা পাচ্ছেন ইউরোপ মহাদেশের বাইরে প্রথম একজন বিজ্ঞানী। রসায়নে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে জন্মের দেড়শো বছর পরে এই বিরল সম্মান তিনি পাচ্ছেন!) ১৯০৩ সাল নাগাদ তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস' (History of Hindu Chemistry) প্রকাশিত হল। দেশে বিদেশে তাঁর এই বইটি এখনও উচ্চপ্রশংসিত। বইটি বিজ্ঞানের ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হিসাবে এখনো বিবেচিত হয়। কষ্টার্জিত সরকারি চাকরিতে থাকার সূত্রে তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি যদিও দেশপ্রেমী এই মানুষটির আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রতি মানসিক সমর্থন ছিল। কিন্তু অবসর সময়ে তিনি আন্দোলনকে দেখতে, বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এই জনজাগরণ তাঁকে এক নতুন পথের দিশা দিল—বিজ্ঞানকে জাতীয়তাবাদী পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস', ১৮৯২ সালে উৎপত্তি এবং ১৯০২ সালে রেজিস্ট্রিকৃত প্রথম স্বদেশী শিল্প—এই জাতীয়তাবাদী ভাবনারই পরিণতি। তবে বেঙ্গল কেমিক্যাল উৎপাদিত ওষুধের বাজার ধরতে স্বাভাবিকভাবেই বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ওষুধের দোকানদার 'ক্রেতা দেশী ওষুধের চাইতে নামী বিলাতী কোম্পানীর ওষুধ নিতে বেশী পছন্দ করেন'—এই দোহাই দিয়ে ওষুধ নিতে এবং বিক্রি করতে চাইছিলেন না। একমাত্র দোকান 'বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোং'—ওষুধের মান বিদেশী কোম্পানির সাথে সমান হবে—এই শর্তে ওষুধ বিক্রি করতে রাজি হল। দেশীয় এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডা- সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারি, ডাঃ অমূল্যচরণ বসু প্রমুখ ডাক্তার নিয়মিত বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি এটকিনস সিরাপ, সিরাপ অফ হাপোফসফাইট অফ লাইম, প্যারিস কেমিক্যাল ফুড রোগিদের লিখে দিতেন। এছাড়াও আয়ুর্বেদিক প্রথা মেনে বাসক, কুর্চি, কালমেঘ ও জোয়ানের সার তৈরি হত।[১০] ওষুধের দোকানগুলোতে বিদেশী ওষুধের পাশে আস্তে আস্তে দেশী ওষুধ জায়গা করে নিতে শুরু করল। ('দেশ', ১৭ আগস্ট ২০১১সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে: "আমাদের জীবনে তাঁর ভূমিকা আত্মজাগানিয়ার।... বাঙালি জাতিকে নতুন নতুন শিল্পস্থাপন করার কাজে প্রফুল্লচন্দ্র যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যেভাবে সামান্য মূলধন সম্বল করে নিজে একটি ওষুধ তৈরির সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই শিল্পসংস্থাকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা আজ ইতিহাস। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, কবির সার্ধশত জন্মবর্ষ যে সমারোহ পালিত হচ্ছে, সেই উত্তুঙ্গমাত্রায় আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে স্মরণ করি নি।... তাঁর প্রতি আমাদের এই ঔদাসীন্য কেন, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, শিল্প বনাম কৃষির তুমুল বিতর্কে আমবাঙালি যখন শিল্পকে প্রায় কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করে চাষবাসের মধ্যে তার মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন এই শিল্পোদ্যোগী মহাপ্রাণকে ভুলে থাকাই তো স্বাভাবিক!...")

একজন স্বাধীন বেসরকারি চিকিৎসক হিসাবে নীলরতন সরকার তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একজন সফল চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ভারতে প্র্যাকটিসরত ব্রিটিশ ডাক্তারদের সাথে ভারতীয় ডাক্তারের সমমর্যাদার লড়াইয়ের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে তিনি এবং ডাঃ সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারি চিকিৎসক-ফি দু' টাকা থেকে বাড়িয়ে চৌষট্টি টাকা করেন। তবে চিকিৎসক-সম্মানী বাড়ালেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি কখনও দূরে সরে থাকেন নি। দরিদ্র রুগিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা থেকে শুরু করে, তাঁদের ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থাও করতেন। ১৮৯৪ সালে বিলিয়ারি সিরোসিস-এর ওপর তাঁর একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি রোগের কারণ হিসাবে শাসকবর্গের অবহেলা, পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাবের কথা বলেন। রোগ প্রতিকারের জন্য তিনি ওষুধ, খাদ্যতালিকা এবং পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে শাকবর্গের অবহেলার কারণে ৯৫ শতাংশ শিশু জন্মের দ্বিতীয় বর্ষে মারা যেত এবং কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তারা সুস্থ হয়ে উঠত।[১১] ১৮৮৭ সালে প্রধানত তাঁর এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের উদ্যোগে ৮জন ছাত্র নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। ভারতে এটি প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখার জায়গা।[১২] সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও ছিল। আর্থিক অভাবের জন্য ছাত্ররা প্রাথমিকভাবে মেয়ো ও চাঁদনি হাসপাতালে গিয়ে রোগি দেখত। ১৮৮৯-৯০ সালে এখানে শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ লালমাধব মুখার্জী—এইসব প্রথিতযশা চিকিৎসকরা। কেবলমাত্র যাতায়াতের ভাড়া ছাড়া তাঁরা কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। ১৮৯৯ সাল নাগাদ এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ৬০০; এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল: সাধারণের কাছে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার পথ সুগম করা যাতে হাতুড়ে চিকিৎসকের পরিমাণ

কমে এবং দেশীয় ভেষজের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করা। মেডিক্যাল স্কুলে নববর্ষারম্ভে যে বার্ষিক সভা হতো, সেরকম এক সভায় ছাত্রদের কাছে ডাঃ সরকার 'বঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা ও চিকিৎসা ব্যবসায়' নামে এক বক্তৃতা করেন।[১৩] ঐ বক্তৃতায় তিনি এক জায়গায় দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি ও ভেষজের উল্লেখ করে বলেন, "দ্রব্যগুণ বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা অনেক স্থলেই আমাদের পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের সাথে মিলে যায়।... তাঁরা যে রোগে যে প্রকারের ওষুধ প্রয়োগ করতেন, আমরাও এখন অনেক সময় সেই প্রকারের ওষুধ প্রয়োগ করে থাকি।" চিকিৎসক-পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে হলে একজন ছাত্রের কী কী গুণ থাকা উচিত সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উল্লেখ করে বলেন: "রোগীর প্রতি মিত্রভাব ও দয়া, সমর্থ ব্যক্তির প্রতি প্রীতি প্রদর্শন, প্রকৃতস্থ প্রাণীদিগের প্রতি উপেক্ষা—এই বৈদ্যদের চারপ্রকার বৃত্তি।" সবশেষে তিনি বলেন, "আমাদের আশা হয় কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল কালে বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে শত শত সুশিক্ষিত চিকিৎসক প্রেরণ করে, আমাদের দেশের এই দুর্দশা দূর করতে কিছু পরিমাণে কৃতকার্য হবেন। এইভাবে আমরা হাতুড়ে নামক অদ্ভুত জীবদিগের ডাক্তারী বৃত্তি ছাড়াইতে সমর্থ হব।"

পাশাপাশি ১৮৯৫ সালে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের জায়গায় মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল' নামে একটি কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নেয়।[১৪] কলেজের নিয়মকানুন স্থির করার দায়িত্ব এক উপসমিতির হাতে দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী স্থির হয়, ইংরেজি শ্রেণীতে পঠনপাঠনের সময়কাল চার বছর এবং বাংলা শ্রেণীতে পঠনপাঠনের মেয়াদ তিন বছর করা হয়। এও ঠিক হয় মাতৃভাষার ছাত্রদের কোনও পরীক্ষার ফি দিতে হবে না, পরীক্ষা বছরে একবার অর্থাৎ মে মাসে নেওয়া হবে। ১৬৫ বউবাজার স্ট্রীটে প্রাথমিকভাবে এই কলেজ স্থাপিত হয়, পরে এই কলেজ ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডের নতুন বাড়িতে বদল হয় এবং ১৮৯৭-৯৮ সালে এখানে নতুন ক্লাস শুরু হয়। পরে এই দুটি স্কুল একত্রিত হয়ে বেলগাছিয়ায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (যা বর্তমানে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ) হয় ১৯১৬ সালে। প্রতিষ্ঠানটির স্কুল এবং কলেজ দুটি শাখাই ছিল।[১৫] বলা যায়, কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় যে বিপুল অর্থের দরকার হয়েছিল, সেখানে ডাঃ সরকারের নিজের অর্থ তো ছিলই, বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সহায়তায় এবং আরো কিছু ধনী ব্যক্তির দানে সেই অর্থ যোগাড় হয়েছিল। ১৯১৬ সাল থেকে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়।[১৬] (এটা খুবই আশ্চর্যজনক, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ওয়েবসাইটে ডাঃ নীলরতন সরকারের কোনও উল্লেখ নেই! অথচ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়/বই-এ কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রধান স্থপতি এবং সভাপতি হিসাবে ডাঃ নীলরতন সরকারের উল্লেখ আছে![১৭])

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে নীলরতন সরকার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৮] ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের অনেক মাত্রা ছিল। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৃত্তে আন্দোলন যেমন একটা মাত্রা, পাশাপাশি পরাধীন জাতির আত্মোপলব্ধি, শাসক-শাসিতর তফাৎ বুঝতে পারা, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও সেই উপলক্ষে বিভিন্ন দেশীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, বিজ্ঞানের এবং অন্যান্য বিষয়ের দেশীয়-পরিভাষা তৈরির চেষ্টা, এসবও স্বদেশী আন্দোলনের অন্য অনেক মাত্রা। এক জাতীয় শিক্ষার—যার মূল থাকবে এদেশের মাটিতে, প্রাচীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার প্রতিশ্রদ্ধাশীল, যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী গতিশীল এবং অবশ্যই জাতীয় উন্নতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ—প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতে শুরু হয়েছিল ১৯০২ সাল নাগাদ সরকারের 'ইউনিভার্সিটি বিল' প্রকাশ হবার পর। ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ তখনকার বড়লাট লর্ড কার্জন শিক্ষার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সব শিক্ষা আধিকারিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সিমলায় এক গোল টেবিল বৈঠক করেন এবং ১৯০২-এ 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশনে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী। স্যার গুরুদাস ব্যানার্জীর প্রতিবাদসহ এই রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয় তখন এ নিয়ে শিক্ষিত মহলে হইচই পড়ে যায়। কমিশনের এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট' পাশ হয়। 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট'-এর প্রধান বৈশিষ্টগুলো ছিল: ১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারের লক্ষ্যে, পাঠাগার ও গবেষণাগার গঠন, শিক্ষক নিয়োগ এবং ছাত্রকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি হবে, ২) ফেলোর সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-র মধ্যে হবে এবং একজন ফেলো সর্বোচ্চ ছ'বছর থাকতে পারবে। ৩) সরকার দ্বারাই প্রায় সব ফেলো নির্বাচিত হবেন; নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ২০ জন এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন। ৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কোনও আইন প্রণয়ন করলে গভর্ণরের পক্ষে সরকার ভেটো দিয়ে সেই আইন রদ করতে পারবে। সরকার যদি মনে করে তাহলে সেনেট প্রণীত আইন রদবদল করতে পারবে, প্রয়োজনে সেনেটের সম্মতি ছাড়াও নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারবে। ৫) এই আইনের ফলে বেসরকারি কলেজগুলোর ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ আরো দৃঢ় হল। একটি বেসরকারি কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে গেলে সরকারি আদেশ জরুরি। ৬) গভর্ণর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা নির্দেশের ও কলেজের অনুমোদনের ক্ষমতা দেওয়া হল। বলতে গেলে, উচ্চশিক্ষাকে পুরোপুরি সরকারি কুক্ষিগত করার চক্রান্ত! সমসাময়িক বাংলার এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় যেমন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত 'বেঙ্গলী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', মতিলালা ঘোষ সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দি ডন' এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী'-তে ছাপা হয়েছিল। তবে কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছিলেন শ্রী সতীশচন্দ্র মুখার্জী মহাশয়। ১৯০২ সাল নাগাদ তাঁর সম্পাদিত 'দি ডন' পত্রিকার পরপর তিন সংখ্যায় 'An Examination into the Present System of

University Education in India and a Scheme of Reform'—এই নামে তিনি এক প্রবন্ধ লেখেন। শুধু প্রবন্ধ লেখাতেই তিনি থেমে থাকেন নি, ব্যবহারিক দিকে জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধক প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে 'ডন সোসাইটি' (১৯০২-০৭) নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সতীশচন্দ্র মুখার্জীর তৈরি এই ডন সোসাইটি 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট' পাশ হবার পর শুধু দেশেই নয় বিদেশী শিক্ষাবিদরাও এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। অ্যানি বেসান্ত 'ডন অ্যান্ড ডন সোসাইটি ম্যাগাজিন'-এ ১৯০৬ সালে লেখেন 'শিক্ষিত ভারতীয়দের উচিত শিক্ষার প্রশ্নকে তাদের নিজেদের হাতে নেওয়া' ভ্যালেনটিন কিরল-ও লেখেন, 'ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে ইচ্ছে করে গলা টিপে ধরার কারণে লর্ড কার্জনকে দোষী করা যায়।'[১৯]

১৯০৫ সালে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক টাউন হল সমাবেশ থেকে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। শুধু কলকাতার ছাত্ররাই যে এই বয়কটে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তা নয়, মফস্বল ও গ্রামের ছাত্ররাও এতে প্রত্যক্ষভাবে সামিল হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উজ্জ্বল ছাত্র নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, বিনয় কুমার সরকার, রবীন্দ্র নারায়ন ঘোষেদের নেতৃত্বে ছাত্ররা সরকার পরিচালিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি আর এস এবং এম এম এ পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার বাহাদুর স্বাভাবিকভাবেই এই ছাত্র বিক্ষোভ ভালভাবে নেয় নি। আর তা দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে সরকারের প্রধান সচিব আর ডাবলিউ কার্লাইল এক গোপন আদেশনামা ('রাজনৈতিক মিটিঙ—বিশেষ করে বয়কট, স্বদেশী মিটিঙ, ধর্ণা প্রভৃতি থেকে ছাত্রদের প্রতিহত করা এবং প্রয়োজনে কঠোর শাস্তি প্রদান'[২০]) সব জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের দেন। কার্লাইল সার্কুলার জাতীয় সংহতিকে আরো বেশি করে উস্কে দিল। পটলডাঙ্গার চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত অনেক ছাত্রর উপস্থিতিতে সতীশ চন্দ্র মুখার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পালরা এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে সরব হন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বক্তব্যে ছাত্রদের অবস্থানকে পূর্ণ সমর্থন জানান।[২১] কার্লাইল সার্কুলারের প্রথম কোপ পড়ে রংপুর জেলা স্কুল এবং টেকনিক্যাল স্কুলে, যেখানে ৮৬ জন ছাত্রকে সরকার বিরোধী মিছিল-মিটিঙে অংশগ্রহণ করার জন্য ৫ টাকা করে জরিমানা করা হয়। এই খবর কলকাতার খবরের কাগজে বেরোনোর পর এই ঘটনার প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ারে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশ হয় এবং ঐ সমাবেশ থেকে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের দাবিও উঠে আসে। সেই উপলক্ষে রাজা প্যারী মোহন মুখার্জীর সভাপতিত্বে ১৬ নভেম্বর ২০০৫ সালে বাংলার প্রায় সকল প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব—সতীশ চন্দ্র মুখার্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার, তারকনাথ পালিত, ক্ষুদিরাম বোস, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গুরুদাস ব্যানার্জী প্রমুখ—এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। ছাত্রদের মতামত জানানোর জন্যও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিশিষ্ট ছাত্রকেও এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হল। এই সম্মেলন থেকে দুটো সিদ্ধান্ত গৃহীত হল: ১) সভার মত অনুযায়ী, দেশীয় ভাবধারায় এবং সম্পূর্ণ দেশীয় পরিচালনাধীন প্রথাগত, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার উদ্দেশ্যে এক জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ খুব শীঘ্রই গঠন করা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদের নিয়ে এক প্রভিশনাল কমিটি গঠন করা হবে আর এই কমিটিকে বলা হচ্ছে তারা যেন তিন সপ্তাহের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। ২) সভা পি আর এস, এম এ এবং অন্যান্য ছাত্রদের আত্মোৎসর্গ এবং নিষ্ঠাকে পূর্ণ সমর্থন করে কিন্তু সভা এ-ও মনে করে দেশকে সেবা করার স্বার্থে তাঁরা যেন আগামী পরীক্ষাগুলো দেন।[২২] ৪২ জনকে নিয়ে প্রভিশনাল এডুকেশন কমিটি সেই দিনই গঠিত হয় এবং নীলরতন সরকার ও আশুতোষ চৌধুরী এর সচিব নির্বাচিত হন। এর পাশাপাশি পিয়ারিমোহন মুখার্জী, তারকনাথ পালিত, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, কালীনাথ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিকে নিয়ে এক প্রভিশনাল ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয় এবং কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠনের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। প্রভিশনাল কমিটির রিপোর্ট পেশ করার পর, তার ভিত্তিতে ১০ ডিসেম্বর ১৯০৫ সালের আর একটি মিটিং-এ 'ওয়েস অ্যান্ড মিনস কমিটি ৯০ (Ways and Means Committee)' নামে একটি ছোট কমিটি তৈরি করে। এই কমিটিতে ছিলেন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, সতীশচন্দ্র মুখার্জী, নীলরতন সরকার (সচিব), সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, আব্দুল রসুল প্রমুখ শিক্ষাব্রতীগণ। এই কমিটির প্রধান কাজ হল জাতীয় শিক্ষার পদ্ধতি এবং তার পাঠ্যক্রম তৈরি করা। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পঠনপত্রিকা তৈরি করতে গিয়ে তার সমস্যা, দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, বিদেশী ব্যবস্থার সাথে প্রধানত কী কী তফাৎ হওয়া প্রয়োজন আর কেনই বা প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসমস্যা' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।[২৩] সেখানে তিনি লেখেন: "...বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে; কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন আদর্শ বহু দিন মুগ্ধ করিয়াছে...তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। ...বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্যস্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব।" তিনি বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালে বদ্ধ শিক্ষার চাইতে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে আশ্রম শিক্ষার ওপরেই বেশি জোর দেন। বিভিন্ন মতামতের ওপর ভিত্তি করে এবং ভীষণ ভাবে খেটে কমিটি তার পূর্ণ রিপোর্ট ১৯০৬-এর মার্চ মাসে প্রকাশ করে।[২৪] রিপোর্টে পরিষদের নাম, উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক সংবিধান, এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ স্তরে পঠন-বিষয় ও তার সময়সীমা (যেমন প্রাথমিক স্তরে তিন বছর, নিম্ন বুনিয়াদি স্তরে পাঁচ বছর, উচ্চ বুনিয়াদি স্তরে দুই

বছর, কলেজ স্তরে চার বছর, ইত্যাদি) প্রকাশ করা হয়। নাম দেওয়া হয়—জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ (The National Council of Education); উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়—বর্তমান প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশীয় ভাবধারায় এবং সম্পূর্ণ দেশীয় পরিচালনাধীন প্রথাগত, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদান করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নীলরতন সরকার (সচিব), মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রমুখ শিক্ষাবিদ সম্পূর্ণ দেশীয় পরিচালনাধীন প্রায়োগিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠনের ওপর জোর দেন। সেই উদ্দেশ্যে গঠিত হয় সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অভ টেকনিক্যাল এডুকেশন (এস পি টি ই); জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কিছু বিদ্যালয় ও কলেজ গঠন করে (১৯০৭ সাল অব্দি বাংলায় ২০টি বিদ্যালয় তৈরি হয়[২৫] এবং 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল' চালু হয় ১৫ আগস্ট, ১৯০৬ সালে ১৯১/১ বউবাজার স্ট্রীটে—যার প্রথম অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ), পরের সংস্থাটি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (২৫ জুলাই, ১৯০৬) গঠন করে, যা বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে তিনজনের ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁদের অবদান আমরা হয়তো ভুলে গেছি, বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণ করে যাচ্ছি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত। বক্তৃতামালা বা সঙ্গীত, গল্প, কথকতার সাহায্যে তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো যায় না। তাঁদের কাজকে আত্তীকরণ করে ভবিষ্যতের পাথেয় করতে পারলে ভাল হয়।

সহযোগী গ্রন্থপঞ্জী:

১. EMS Namboodripad, 'A History of Indian Freedom Struggle' (India 1986).

২. প্রশান্ত কুমার পাল, 'রবিজীবনী' (পঞ্চম খণ্ড) পৃ: ২৬৪ (আনন্দ, ২০০৭); বঙ্গদর্শন, ৩৪৯ (কার্তিক, ১৩১২)।

৩. রঞ্জন গুপ্ত, 'ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন' (আনন্দ, ২০০৯)।

৪. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী (পঞ্চম খণ্ড) পৃ: ২৬৪ (আনন্দ, ২০০৯)।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্গবিভাগ', রবীন্দ্ররচনাবলী, পৃ: ৩৪২ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০)।

৬. অরুণাভ মিশ্র, 'প্রফুল্লচন্দ্র রায়', পৃ: ১২, (পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ২০১০)।

৭. শ্যামল চক্রবর্তী, 'ঐতিহ্য উত্তরাধিকার ও বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র' পৃ: ২৬ (সাহিত্য সংসদ, ২০১১)।

৮. P.C.Ray, Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 65, 1-9 (1896).

৯. Nature (1896).

১০. Prafulla Chandra Ray, 'Life and Experience of a Bengali Chemist', pp 92 (The Asiatic Society, 1996);শ্যামল চক্রবর্তী, 'ঐতিহ্য উত্তরাধিকার ও বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র' পৃ: ২৬ (সাহিত্য সংসদ, ২০১১)।

১১. Nilratan Sircar, Biliary Cirrhosis (1894), Reprint, Calcutta Medical Journal, vol, 40, p. 220 (1943);মানবেন্দ্র নস্কর, ইতিহাস অনুসন্ধান খণ্ড ২৪, পৃ ৬৯১।

১২. বিনয়ভূষণ রায়, 'চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস', পৃ ১২৮ (সাহিত্যলোক, কলকাতা ২০০৫)।

১৩. বিনয়ভূষণ রায়, 'চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস', পৃ ১৩০ (সাহিত্যলোক, ২০০৫); নীলরতন সরকার, 'বঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা ও চিকিৎসা ব্যবসায়', ভিষক দর্পণ, ২য় খণ্ড, অতিরিক্ত পত্র (১৮৯২-৯৩)।

১৪. বিনয়ভূষণ রায়, 'চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস', পৃ ১৩৪ (সাহিত্যলোক, ২০০৫)।

১৫. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, 'বাংলাপিডিয়া' (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)।

১৬. শ্যামল চক্রবর্তী, 'এখনো গেল না আঁধার', উৎস মানুষ, ৩১ বর্ষ, ১৫ (এপ্রিল-জুন, ২০১১)।

১৭. Hundred Years of teh University of Calcutta (University of Calcutta, 1957).

১৮. S.K Lahiri, 'Sir Nilratan Sircar', The Modern Review, pp 267 (Oct., 1961).

১৯. H. Mukherjee and U. Mukherjee, 'The origins of the National Education Movement' pp 15 (National Council of Education, Calcutta 2000).

২০. The Amrita Bazar Patrika (Nov. 2, 1905).

২১.সঞ্জীবনী (নভেম্বর ২, ১৯০৫); ভাণ্ডার (অগ্রহায়ণ, ১৩১২)।

২২. H. Mukherjee and U. Mukherjee, 'The origins of the National Education Movement' pp 37 (National Council of Education, Calcutta 2000).

২৩. 'শিক্ষা', রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), একাদশ খণ্ড (পশ্চিবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)।

২৪. Dawn Magazine, pp 104-112 (March 1906).

২৫. H. Mukherjee and U. Mukherjee, 'The origins of the National Education Movement' pp 113 (National Council of Education, Calcutta 2000).

উ মা

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হতে গেলে

গ্রাহক চাঁদা সডাক ৮০.০০ টাকা

হাতগ্রাহক ৬০.০০ টাকা

চাঁদা পাঠাবেন কীভাবে—

United Bank of India, College Street Branch, Kolkata- 7000073

Utsa Manush

SB Account no. 0083010748838

এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে আপনারা চেক অথবা টাকা জমা দিয়ে দেবেন এবং ফোন করে কিংবা মেল করে আপনার নাম ঠিকানা আমাদের জানিয়ে দিলেই আপনাকে গ্রাহক করে নেওয়া হবে। চিঠি লিখেও জানাতে পারেন। কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না। যোগাযোগের ঠিকানা, মেল আই-ডি, ফোন নং সব কিছু পত্রিকাতেই পেয়ে যাবেন।

আগামী সংখ্যা এপ্রিল মাসে। বিশেষ ক্রোড় পত্র 'আবহাওয়া বিজ্ঞান'

জেহাদি বনবিহারী

সমীরকুমার ঘোষ

গত সংখ্যার পর

সজনীকান্ত দাস ও তাঁদের 'শনিবারের চিঠি'র ভয়ে একটা সময় তটস্থ থাকতেন তাবৎ কবি-সাহিত্যিক। কারণ এই পত্রিকা কাউকেই রেয়াত করত না। এমনকি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্রকেও এঁরা সমালোচনার চোখা চোখা বাণে বিদ্ধ করেছেন। এ হেন 'বিশ্বনিন্দুক' সজনীকান্ত কিন্তু বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। 'আত্মস্মৃতি'-র বহু জায়গায় দেদার গুণকীর্তন করেছেন বনবিহারীর। একজায়গায় লিখছেন, '...দুইজন অতি শক্তিমান লেখককে আমি আকর্ষণ করিলাম— একজন, ইঞ্জিনিয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং অন্যজন ডাক্তার লেখক শ্রী বনবিহারী মুখোপাধ্যায়।' সজনীকান্ত আরও জানাচ্ছেন, 'শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম.বি. তখন 'বঙ্গবাণী'র আসরে খ্যাতিমান। তাঁহার সামাজিক নাটক 'একাল', উপন্যাস 'যোগভ্রষ্ট', 'দশচক্র', গল্প 'সিরাজীর পেয়ালা' বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতেছে। ১৩৩৩ হইতে ১৩৩৪-এর মাঘ মাসের মধ্যেই তাঁহার গল্প-উপন্যাস-প্রতিভা তাঁহার প্রাচীনতর কীর্তি 'বেপরোয়া'কে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাঁহার কবিতা ও কার্টুন-ছবি সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' জলধরদাদা সার্টিফিকেট দিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'র রচনাভঙ্গি ও ব্যঙ্গপ্রিয়তা এই গুণী ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিল, আকর্ষণের বিশেষ কারণ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমার অভিযান।' বাংলা দেশের ব্যর্থ তারুণ্যের দম্ভকে তিনি বরাবরই অত্যন্ত ঘৃণা ও অনুকম্পার সঙ্গে দেখিতেন। 'বেপরোয়া'তেও তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তিনি সুদূর মফস্বল হইতে (সম্ভবত ময়মনসিংহ, সেখানে তখন তিনি সিভিল সার্জন) "আমিও আছি" বলিয়া সাড়া দিলেন। ফাল্গুন সংখ্যার জন্য আসিয়া পৌঁছিল ''আধ্যাত্মিক জাতি''র বিরুদ্ধে একটি সচিত্র কবিতা—একটি বমশেল! বলা বাহুল্য, চিত্রগুলি তাঁহারই অঙ্কিত।' এটুকু তথ্য জানানোর পরও সজনীকান্তের মতো কড়া সমালোচকও বনবিহারীকে দরাজ হস্তে সার্টিফিকেট দিয়ে লিখেছেন—'ঠিক তাঁহার জাতের কার্টুনিস্ট আর এ দেশে হয় নাই। লেখা এবং ছবি—এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও বলে আমায় দ্যাখ্, অদ্ভুত সামঞ্জস্য! অত্যদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহার!'

কী লিখেছিলেন বনবিহারী সেই 'আধ্যাত্মিক জাতি' কবিতায়, যা পড়ে সজনীকান্ত অত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন? কার্টুন কেমন এঁকেছিলেন জানি না, তবে বনবিহারী লিখেছিলেন—

"জেনেছি আত্মা অবিনশ্বর, জেনেছি মিথ্যা দুনিয়া।—
তাই আমাদের নাহি ভয় কানা-কৌড়ি;
তাই পথ চলি দিনক্ষণ বেছে, খনার বচন শুনিয়া,
সাহেব এড়াই সেলাম করি' বা দৌড়ি';
কারণ আমরা আধ্যাত্মিক জাতি!
ইহকালে যারা মজা লুটিবারে লুটে নিক,—
আমরা রহিনু পরকালে হাত পাতি'।"

'বৈজ্ঞানিক তারুণ্যের স্বপক্ষে আমাদের পচা প্রাচীনতার বিরুদ্ধে', এইভাবে উল্টো চাপ দিয়েই শনিবারের চিঠি-র আসরে অবতীর্ণ হন বনবিহারী। সজনীকান্ত জানিয়েছেন, এই কালাপাহাড়ী সুরটাও 'শনিবারের চিঠি'র নিজস্ব, পূর্বাপর বজায় আছে। বনবিহারীবাবু আসিয়া এই দিকটাতে বিশেষ জোর দিলেন আসর জমিয়া উঠিল।'

'শনিবারের চিঠি'তে কালাপাহাড়ী সুরটা বনবিহারী বহুদিনই বজায় রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ সব লেখা ও কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকার পাতায়। ১৯২৯ সালে 'শনিবারের চিঠি' উঠে আসে শ্রীমানী বাজারের দোতলায়, ১৬/১ নং ঘরে। তারপর থেকে পত্রিকার রমরমা কমতে থাকে। সজনীকান্ত নিজেই জানিয়েছেন, 'শনিবারের চিঠি'র এই ক্রমাবনতির যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা "নরকের কীট" প্রকাশ। লেখকের নাম ছিল না, কিন্তু এই একটি গল্পের আঘাতে বাংলা সাহিত্য-সরোবর তোলপাড় হইয়াছিল।' সজনীকান্ত গল্পটি পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে লেখেন, 'শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় যদি আর কোন গল্পও না লিখিতেন—শুধু একটির জোরে অমর হইয়া থাকিতেন। ..."নরকের কীট" সে যুগের তরুণদের বিস্মিত করিয়াছিল। গল্পটির জনপ্রিয় হওয়ার বাধা ছিল—প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত ইংরেজী বুক্‌নিগুলি; অনেকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। 'বেপরোয়া' মতবাদের জন্য প্রাচীনপন্থীরাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও "নরকের কীট" বাংলা সাহিত্যে "আগে বাড়া"র একটি মাইল-স্টোন; অবিশ্রাম ঘাত-প্রতিঘাতে তরুণ এবং তরুণ-বিরোধী উভয় দলই যখন ঘায়েল হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, 'নরকের কীট' তখন একটা নাড়া দিয়াছিল।' এই কথাগুলো সজনীকান্ত বনবিহারীকে তোল্লাই দেওয়ার জন্য বলেননি। তাঁর এই মূল্যায়নে একটুও অতিরঞ্জন ছিল না। আর

ছিল না বলেই বনবিহারীর 'যোগভ্রষ্ট' ও 'দশচক্র' রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে বার করে, তাঁর 'শিরাজীর পেয়ালা', 'নরকের কীট' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প ও 'একাল' নাটকটি বই আকারে ছাপার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। বনবিহারীই তাঁকে এগোতে দেন নি। ফলে এই সব অমূল্য রত্নরাজি কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছে।

এখনকার পাঠক চাইলেও আর সে সব লেখার নাগাল পাবেন না। তাই 'নরকের কীট' গল্পের খানিকটা অন্তত উল্লেখ করার প্রয়োজন। গল্পটা শুরু হচ্ছে এইভাবে—

'নরক? — নরকেই ত আছি হে। Been there since 1876। একটা idea দিই। উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—হাঁ হাঁ তাই! I mean your সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—অর্থাৎ কিনা যে দেশে আখ খেজুরের চাষ হয়, এবং জাভা থেকে চিনি আমদানি করতে হয়, যে দেশে জলকষ্ট একটা দৈনন্দিন ব্যাপার; এবং যেখানকার মহামান্য চিকিৎসকগণ propaganda work করচেন খোলা বাতাসের বিরুদ্ধে। নাঃ তোমাদের দোষ কি? দোষ সব অশ্লেষা মঘার। —১২৯৯ সাল থেকে দাসত্ব ক'রে আসচে, — অথচ জাতকে জাত সমুদ্রে ডুবে ম'ল না। আজও বাঁচতে চায়, অমর হতে চায়। —আজও বংশবৃদ্ধি করচে, আর রেখে যাচ্ছে কতকগুলো হ্যাংলা ক্যাংলা ছেলের পাল, যাদের পেট ভরবে শুধু পীলে আর লিভারে। A colony of maggots in a dungheap!

ধানের ক্ষেতে লাঙল পড়ে না। তা হোক, ছেলের ক্ষেত পতিত থাকবা; জো নেই, Consent Bill-এর নামে হাহাকার একেবারে!'

উপরের দুটি হল গল্পটির প্রারম্ভিক ছত্র। শেষের দিকে লিখছেন—

'—শ্রদ্ধা? না শ্রদ্ধা আমার কারুর ওপর নেই। যে দেশে কর্মের উপাদান চিৎকার; আর ধর্মের উপাদান গিরিমাটি, যে দেশে অনুপ্রাসের নাম কবিত্ব আর কবিত্বের নাম বিজ্ঞান, হেমচন্দ্র যে দেশের কবি আর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম কাব্য, বিদ্যাসাগর যে দেশে দয়ার সাগর এবং রামমোহন রায় একখানা ছবি, যে দেশে রবীন্দ্র-জগদীশ are applauded simply because they are not appreciated,— সে দেশের কিছুর ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই। I hate everything! Every thing! Every thing!

আজকাল প্রায় শুনতে পাই, 'খদ্দরের loin cloth পর, আর অতীতে ফিরে যাও' —আরে, যাবি কোথায়? অতীত কিছু আছে? জ্ঞানে, কর্মে, বীর্যে, পৌরুষে, কোথায় তোমরা কৃতিত্ব দেখিয়েছ? তোমাদের অতীত তো উমিচাঁদ, ভারতচন্দ্র আর লক্ষ্মণসেন। তোমাদের গর্বের মধ্যে আছে এক ধর্ম, যার জন্য কোনো সাধনা করতে হয় না, কোনো পুরুষকারের দরকার হয় না, যা depends on the length of the টিকি and কচুডাঁটার মতো টিকি আপনি গজায়।—'

এই 'নরকের কীট' গল্পটি শনিবারের চিঠি-তে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬-এর ভাদ্র সংখ্যায়। বাংলা সাহিত্যে সজনীকান্ত দাসের দান অসামান্য। বনবিহারীকে লেখার সুযোগ করে দেওয়া সেই কাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

প্রবন্ধই হোক বা গল্প — বনবিহারী আগাগোড়াই আমাদের ধর্মের নামে, সামাজিকতার নামে, কর্তব্যের নামে ভণ্ডামি, নির্বুদ্ধিতাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। ব্যঙ্গের শাণিত তরবারি চালিয়েছেন। এই যুদ্ধং দেহি মনোভাব সম্পর্কে তাঁর অতি স্নেহের পাত্র মুজতবা আলি লিখেছেন, 'বনবিহারী সমস্ত জীবন ধরে বিস্তর অক্লান্ত জিহাদ লড়েছেন, কিন্তু বর্ণবৈষম্য চোখে পড়লেই তিনি নিষ্কাশিত করতেন তাঁর শাণিততম তরবারি।'

মুজতবার মন্তব্য শোনার আগে আর একবার শনিবারের চিঠিতে যাওয়া যাক। সেটা বাংলার ১৩৩৪। মাঘ সংখ্যায় তৎকালীন তরুণদের কবিতার বিষয় এবং ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করে সজনীকান্ত 'চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর' এবং ফাল্গুনে 'আমি যে প্রথমতম' নামে দুটি কবিতা প্রকাশ করেন। এই কবিতা পড়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং অজিতকুমার দত্ত বিষম চটে যান। তাঁরা তিনজনে পাল্টা 'ঢাকা-ঢিক্কি' নামে একটা কবিতা লিখে শনিবারের চিঠিতেই পাঠান প্রকাশের জন্য। সজনীকান্তের 'আমি যে প্রথমতম' কবিতাটি পড়ে বনবিহারী তাঁকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রে কী লিখেছিলেন তা দেখার আগে সজনীকান্তের কবিতাটির একটু নমুনা দেখা যাক—

'তাজা-বয়লার কয়লাকুঠির ময়লা-গাদার ধারে,
গয়লা-বধূর পয়লা সোয়ামী ফেরে কম্পাস ঘাড়ে।
বিশাই তাহার নাম—
যত বাড়ে বেলা বোঝা ঠেলে ঠেলে ছোটে তত কালঘাম।
ফার্লং দূরে লং সাহেবের অবলং বাংলায়
ধানী গয়লানী সানি দানি' ঘানী-বলদে পানি পিলায়।...'

প্রায় তিন দশক পরে 'আত্মস্মৃতি' লিখতে গিয়ে বনবিহারীর চিঠিটি সম্পর্কে সজনীকান্ত মন্তব্য করেছিলেন, বাঙালী জাতির তৎকালীন চরিত্র-শৈথিল্য এবং শিল্প-সাহিত্য ও জীবনে তাহার প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার তীব্র বক্রোক্তি আজিও স্মরণ করিবার যোগ্য।'

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সেই চিঠি—

' 'গয়লা-বধূর পয়লা সোয়ামী' ক্যারিকেচার বলে লোকে বুঝতে পারবে তো? আজকালকার বাজারে ঐ রকম ভাষা ও ভাবই যে সাব্লাইম! তরুণের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযান কেন? তাঁরা কিছু বলেছেন নাকি? হরতাল ছাড়া কিছু করেছেন নাকি? আমার তো মনে হয় তাঁদের এতটা আস্ফালনের জন্য তাঁরা মোটেই দায়ী নন। ভ্রম, সমস্তটাই হচ্ছে ট্রান্‌স্‌মিশন অব ফোর্সেস —কুলোর ওপর ভাঙা কলাইয়ের নৃত্য। আপনারা ভয় পাবেন না, যাকে প্যাথলজিক্যাল মনে করছেন সেটা একেবারেই ফিজিকাল; গ্রীষ্মকালে কোল্ডব্লাডেড অ্যানিমালের টেম্পারেচার বাড়ে, সেটা জ্বর নয়। আমাদের এ এক অপূর্ব দেশ! এখানে সাম্যের ধারণা

জাগলে লোকে পৈতে পরে বামুন হতে চায়। এখানে সমানাধিকারবাদের ফলে মেয়েদের খোঁপা কমে না পুরুষের খোঁপা বেড়ে যায়।

উল্কিপরা ঝিতে আপত্তি করলে চলবে কেন? ও ছাড়া লোক কোথায়? আমরা যখন রাণী বাণী, শ্যামা এলা, বেলা, স্টেলার কথা লিখি তখন যে মনে পড়তে থাকে ঐ ঝিটাকে। উর্বশী মেনকার কটাক্ষে কাজ হ'ত। ঝির বেলায় চাই হেমেন্দ্র মজুমদারিজম্ — তা না হ'লে প্রেম জাগবে কেন? যাঁদের অবশ্য হায়ার সেন্‌সিবিলিটিজ তাঁদের এতটা দরকার হয় না। তাঁদের এক-গাল ভাত বেশী খাইয়ে দিতে হয়। প্রমাণ 'পথের দাবী'র ভারতী। তিনি নামলেন জুতো পায়ে—কিন্তু কথা কইলেন সাবিত্রী রাজলক্ষ্মীর সুরে—আর দুটি ভাত খাও।"

বনবিহারীর এই তীব্র ভাষার চাবুক চালানো দেখেই মুজতবা আলি বলেছিলেন 'বনবিহারী তাঁর জিহাদ চালাতেন হৃদয়হীন যুযুধানের মত। তাই সত্যের অপলাপ না করে অনায়াসে বলতে পারি, তাঁর মত মিলিটেন্ট নাস্তিক এ-দেশে তো কখনই জন্মায় নি, বিদেশেও নিশ্চয়ই মুষ্টিমেয়। 'পীসফুল কো-এগ্‌জিজস্টেনস্' নীতিটি তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন হাসপাতালের ভিতরে বাইরে সর্বত্রই, এবং টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ডিউটির সার্জন। তাঁর বক্তব্য, 'তোমার পায়ে হয়েছে গ্যাঙ্‌রীন, সেটা আমি কেটে ফেলে দেব। গ্যাঙ্‌রীনের সঙ্গে আবার পীসফুল কো-এগ্‌জিজস্টেনস্ কি?' এতটুকু বলার পরও পাছে কেউ বনবিহারী সম্পর্কে ভুল ধারণা করেন তাই মুজতবা আগেভাগে বলে দিয়েছেন, 'কিন্তু পাঠক ভুলে ক্ষণতরেও ভাববেন না বনবিহারী অসিহষ্ণু ছিলেন। এর চেয়ে বৃহত্তর, হীনতর মিথ্যা ভাণ কিছুই হতে পারে না।'

তাঁকে যাঁরা অসহিষ্ণু মনে করতেন তাঁদের উদ্দেশে বনবিহারীর বক্তব্য ছিল—'তুমি আস্তিক। তোমার মস্তিষ্ক থেকে আমি সেই অংশ ছুরি দিয়ে কেটে ফেলব। কিন্তু তোমার প্রতি আমি অসহিষ্ণু হব কেন? বস্তুত চিকিৎসক বলে আমার সহিষ্ণুতা অনেক বেশী। তোমার পরিচিত কারো সিফিলিস হলে তুমি শুধু সিফিলিস না, সেই লোকটিকেও বর্জন করো। আমি সিফিলিস দূরীভূত করি, কিন্তু সে হতভাগ্যকে তো দূর দূর করে দূরীভূত করার চিন্তা আমার স্বপ্নেও ঠাঁই দিই না। প্লেগ এলে তুমি এ শহরের নাগরিকদের বিষবৎ বিবেচনা করে তাদের বর্জন করো; আমি তা করি নে।'

মুজতবা বলছেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে শপথ করতে রাজী আছি এটা তাঁর বাগাস্ফালন নয়। কাব্যে আমরা বাক্ ও অর্থের সমন্বয় অনুসন্ধান করি, জীবনে করি বাক্ ও কর্মের। এ দুটির সমন্বয় বনবিহারীতেও প্রকৃতিগত ছিল। বলতে যাচ্ছিলুম 'বিধিদত্ত' কিন্তু তাঁর আত্মাকে ক্ষুব্ধ করতে চাই নে। আবার ভুল করলাম তিনি আত্মাতে বিশ্বাস করতেন না, কাজেই হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধার মতোই তাঁর আত্মাকে নিপীড়িত করার সম্ভাবনা!'

বনবিহারী ছোটবেলায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণই ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ নৈয়ায়িক পরিবারে বেড়ে ওঠার দরুণ শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করেছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবস্থায়ও সূর্যোদয় থেকে প্রারম্ভ পূজা-অর্চনা শেষ করতে করতে কোনো কোনো দিন নাকি ক্লাসের সময় পেরিয়ে যেত। 'এ হেন আস্তিক বনবিহারী অকস্মাৎ একদিন নাস্তিক রূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করলেন ও শুধু শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম (রিচুয়েল) নয় শঙ্করাচার্যের নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে হাঁচি টিকিটিকির বিরুদ্ধে তীব্র কর্কশ কণ্ঠে মারমুখো জিহাদ ঘোষণা করলেন। খৃষ্টান মিশনারী পর্যন্ত তাঁর বিস্ময়ের দৃঢ়তা, উদ্দীপনা এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখলে বিস্ময়ের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করতো।'

বনবিহারী অনেকটা মহাভারতের অভিমন্যুর মতো চারিদিকে ঘিরে-ধরা সপ্তরথীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন একা, কিন্তু তাঁর চারধারে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল অনেক। মুজতবা আলি তারই ফর্দ বানাতে গিয়ে বলেছিলেন—'পাঠক মোটেই ভাববেন না, বনবিহারীর প্রধান সংগ্রাম ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। তাঁর সংগ্রাম ছিল জড়তা, কুসংস্কার, ধর্মের নামে পাপাচার, সামাজিক অনাচার, তথাকথিত অপরাধীজনের প্রতি অসহিষ্ণুতা, যাজক সম্প্রদায়ের শোষণ, চিন্তা না করে বাঁধা পথে চলার বদঅভ্যাস, মহরমের তাজিয়ার সামনে কুমড়ো-গড়াগড়ি, যৌন সম্পর্কের ওপর তথাকথিত শালীনতার পর্দা টেনে আড়ালে আড়ালে কুমারী ও বিধবার সর্বনাশ, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের অকারণ দম্ভ, অব্রাহ্মণের অহেতুক দাস্যমনোবৃত্তি, তথাকথিত সত্যরক্ষার্থে সত্য গোপন। স্বার্থান্বেষণে বিদেশীর পদলেহন ও অন্ধানুকরণ কিন্তু যেখানে সে মহৎ সেটাকে প্রচলিত ধর্মের দোহাই দিয়ে বর্জন, বৎসরের পর বৎসর, প্রতি বৎসর রুগ্না অর্ধমৃতা স্ত্রীকে গর্ভদান করে তার কাতর রোল অনুনয়-বিনয় পদদলিত করে তাকে অবশ্যম্ভাবী অকালমৃত্যুর দিকে বিতাড়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে, ধর্মসভায় সচ্চরিত্র সজ্জন খ্যাতি অর্জন (বলাবাহুল্য চিকিৎসক হিসাবে ঠিক এই ট্র্যাজেডি তাঁর সামনে এসেছে বহু, বহুবার), গণিকালয় থেকে একাধিকবার বিবিধ মারাত্মক ব্যাধি আহরণ করে নিরপরাধ অর্ধাঙ্গিনীর শিরায় শিরায় সেই বিষ সংক্রামণ একবার একটি ভুল করার জন্য অনুতপ্তা রমণীকে ব্ল্যাকমেল করে তাকে পুনঃ পুনঃ ব্যাভিচার করাতে বাধ্যকরণ—

হে ভগবান! এ যে অফুরন্ত ফর্দ!'

মুজতবা আলি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি। বনবিহারী তাঁর বহু লেখা নিজেই ছিঁড়ে ফেলতেন। তবু যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে, তার সিকি পরিমাণ গদ্য, পদ্য, ব্যঙ্গচিত্র সংগ্রহ করলে কেউ যদি তাঁর জিহাদের লক্ষ্য বিষয়গুলো সংকলন করেন, তবে তা মুজতবার প্রদত্ত নির্ঘণ্টের চেয়ে বহুগুণে বৃহত্তর ও কঠোরতর হবে। কথাটা স্বীকার করেছেন স্বয়ং মুজতবা আলিই। **(ক্রমশ)**

উমা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 R.N. 37275/80 Rs. 20.00

৩২ বর্ষ জানুয়ারি-মার্চ ২০১২ ২০.০০ টাকা

পুস্তক তালিকা

১. বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১) সংকলন	৩৫.০০
২. যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪০.০০
৩. বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০
৪. প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
৫. তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) ১৮.০০ রণতোষ চক্রবর্তী	
৬. বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু ৪০.০০ হিমানীশ গোস্বামী	
৭. এটা কী ওটা কেন, সংকলন	৫০.০০
৮. 'আমরা জমি দেই নি, দেব না'	১০.০০
৯. আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান, সংকলন	৫০.০০
১০. আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
১১. প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
১২. বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
১৩. শেকলভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
১৪. প্রমিথিউসের পথে	৩৫.০০
*১৫. ছেচল্লিশের দাঙ্গা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯০.০০
*১৬. খাবার নিয়ে ভাবার আছে	৭০.০০
*১৭. সাপ নিয়ে কিংবদন্তী	৬০.০০

*** পরিবেশক র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন**

উৎস মানুষ-এর প্রাপ্তিস্থান

বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙ্গা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়)। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপন-এর উল্টোদিকে)। অম্লান দত্ত বুক স্টোর, বিধাননগর পৌরসভা—এফ ডি ৪১৫/এ। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রীট। যাদবপুর।

উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক কলকাতা-৭০০০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দূরভাষ-৯৪৩৩০৯৯৯৩১ হইতে মুদ্রিত। বাঁধাই- নিবারণ সাহা।